সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশক.: সিগনেট বুকশপ : কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬০

প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট
রবীন দত্ত

মুদ্রক
গৌর মজুমদার
শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬১ বিবেকানন্দ রোড
কলকাতা ৬

ভূমিকা

আমার একটি উপন্যাসের আংশিক পটভূমির জন্য, আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অধ্যায় সম্পর্কে পড়াশুনা করছিলুম। এই সময় একজন মহারাষ্ট্রীয় যুবকের সঙ্গে আমার আকস্মিকভাবে পরিচয় হয়। যুবকটির নাম বসন্ত গোবিন্দ পোৎদার। সে একজন আলাদা ধরনের শিল্পী। সে আধুনিক চারণের মতন এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন-ভাষ্য একক অভিনয় করে শোনায়। তার মাতৃভাষা মারাঠী। সে হিন্দী এবং উর্দুতেও যথেষ্ট রপ্ত—এবং মাত্র কয়েক মাসের প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে সে বাংলা পড়তে, লিখতে এবং অনর্গল কথা বলতে শেখে। বাংলাতেও ঐ রকম একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়ে সে আমাকে অনুরোধ করে বাংলা ভাষ্যটি লিখে দেবার জন্য। আমি মঞ্চ সম্পর্কে কোনো কাজে কখনো হাত দিইনি, ঐ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই বলেই রাজী হতে পারি না। কিন্তু এই যুবকটি অতিশয় নাছোড়বান্দা। তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসের সন্ধানে আমাকে ব্যাপৃত হয়ে পড়তে হয়। তারপর এই রোমাঞ্চকর ইতিহাস আমার দিন রাত্রির ঘুম কেড়ে নেয়।

এই রচনার বহু উপকরণ বসন্ত গোবিন্দ পোৎদার আমার জন্য সংগ্রহ করে দিয়েছে। গ্রন্থের নামকরণের ব্যাপারেও আমি তার কাছে ঋণী।

আমার এই রচনার জন্য আমি যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা গ্রন্থশেষে দেওয়া আছে। তবু, বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের 'দা রোল অব অনার'। এই বই আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল।

সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের ধারা বিবরণীর বদলে, শুধু বিপ্লববাদীদের কার্য-ক্রমের ওপরেই এখানে জোর দেওয়া হয়েছে। স্পর্শ করা হয়েছে ভারতের সকল প্রান্তের প্রয়াস—তবু এই বই আলোচ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। অনেক কিছুই বাদ গেছে, অনেক ঘটনা যোগ করার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করেছি। কোথাও সত্য ঘটনা থেকে বিচ্যুত হতে চাইনি, তবু আকস্মিক ভুল ভ্রান্তি হতে পারে—কেউ তা দেখিয়ে দিলে নিশ্চিত পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করবো।

আর একটি কথা। এই রচনা বিশ্লেষণ ধর্মী নয়, বরং খানিকটা নাটকীয় এবং কাহিনী প্রধান। তার কারণ এই গ্রন্থ রচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্যেই নিহিত। আমি এই গ্রন্থে কোনো তত্ত্ব প্রচার করতে চাইনি। তবে, আমি মনে করি, আমাদের দেশের সমস্ত মানুষের এই ইতিহাস জানা দরকার। আমরা অনেকেই জানি না। জাতি হিসেবে আমাদের অনেক দোষ আছে কিন্তু এই বিস্মৃতি জঘন্য কৃতঘ্নতার সমান। যে সমস্ত জীবন এবং যোজনার কথা এখানে স্থান পেয়েছে—তাদের তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে আলোচনার নিশ্চিত অবকাশ ছিল। সে সম্পর্কে ভবিষ্যতে আলাদাভাবে কিছু লেখার ইচ্ছে রইলো।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১

গভীর রাত্রির অন্ধকারে, জঙ্গলের মধ্যে রেল লাইনের পাশে দুটি যুবক ডিনামাইট হাতে নিয়ে বসে আছে। একটু দূরেই আড়ালে অপেক্ষা করছে মৃত্যু।

দূরে কাছে নগর, পল্লী এখন ঘুমন্ত, বাতাস ছড়িয়ে যায় নিশীথ কুসুমের ঘ্রাণ, হঠাৎ ডেকে ওঠে রাত-চরা পাখি, আকাশ ছড়িয়ে আছে আকাশে আকাশে।

কত মায়া আর মোহ দিয়ে ঘেরা এই জীবন। তবু কেন ঐ যুবক দুটি স্বেচ্ছায় মৃত্যুর এত কাছাকাছি গিয়ে বসে আছে?

একজন নবীন কিশোর, বাড়িতে রয়েছে তার স্নেহময় বাবা ও মা, এবং ভাই বোন আত্মীয়-স্বজনে ঘেরা একটি শান্তি সুখের সংসার। যখন যা খুশি সে চেয়েছে এবং পেয়েছে। তবু কেন উষ্ণ কোমল বিছানা ছেড়ে সে একদিন গৃহত্যাগ করে? কি তার জ্বালা?

ফাঁসীর আগে কারাগার থেকে একটি ছেলে তার মাকে চিঠি লিখেছিল:

> 'মা, তোমার প্রদ্যোত কি কখনো মরতে পারে? আজ চারিদিকে চেয়ে দেখ, লক্ষ লক্ষ 'প্রদ্যোত' তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি বেঁচেই রইলাম, মা, অক্ষয় অমর হয়ে·····
> বন্দে মাতরম!··

কোথা থেকে সে পেয়েছিল এই মৃত্যুঞ্জয়ী আশাবাদ?

ব্যক্তিগত জীবনের সুখ সম্ভোগ সব ওরা বিসর্জন দিতে পেরেছিল এই দেশের শৃঙ্খল মোচনের জন্য। বিদেশী শাসকের নিপীড়ন ও পরাধীনতার গ্লানি ওদের এক মুহূর্ত শান্তি দেয়নি। জননীর চেয়েও বড় করে দেখেছে জন্মভূমিকে।

প্রবাদের ফিনিক্স পাখি যেমন অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েও সেই ভস্মরাশি থেকে পুনর্জীবন পায়—সেই রকম এই সব দুঃসাহসী মহৎ প্রাণেরও মৃত্যু নেই।

আর সব কিছু তুচ্ছ করে তারা বারবার ফিরে আসতে চেয়েছে এই ধুলোমাটির স্বর্গে।

…শুধু জানি—
যে শুনেছে কানে
তাঁহার আহ্বান গীত.
ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে
বিশ্ব বিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি ;
মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।…

পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষে নেমে এলো পরাধীনতার শৃঙ্খল। কিন্তু সেইদিন থেকেই আবার জাগ্রত হয়েছিল স্বাধীনতার বাসনা। যুদ্ধে হেরেছে কিন্তু এই জাতির আত্মা মরে যায়নি। মনের মধ্যে সব সময় গুঞ্জরিত হয়েছে, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় ?'

বিরোধের ধূম পুঞ্জীভূত হচ্ছিল অনেকদিন ধরে, লর্ড ডালহৌসির আমলে হলো বিস্ফোরণ। ডালহৌসি তো নিমিত্তমাত্র। সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে যে সত্যের শিখা আছে, সেই আগুন একদিন জ্বলে উঠবেই। আগুন জ্বলে উঠলো তিন দিক থেকে। বন্দুকের বুলেটে গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো ছিল বলে উত্তেজিত হয়ে উঠলো সিপাহীরা। অন্যায়ভাবে বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নেবার জন্য দেশীয় রাজারা ক্রুদ্ধ। জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে গেল অর্থনৈতিক শোষণে। শেষের কারণটি এক হিসেবে সবচেয়ে বড়। সেই সময়ে বিলেতে বসে কাল মার্কস সাহেব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সারা ভারতবর্ষ আগে যত অত্যাচার সহ্য করেছে, বৃটিশের অত্যাচার তার শত শত গুণ বেশী।

There can not, however, remain any doubt but that the misery inflicted by the British on Hindusthan is of an essentially different and infinitely more intensive kind than all Hindusthan had to suffer before.

ভারতের এই প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ—যাতে হিন্দু-মুসলমান সবাই এক সঙ্গে লড়েছে, প্রত্যেক ভারতবাসীই প্রত্যেক ভারতবাসীর ভাই —সেই যুদ্ধকে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সুচতুর কৌশলে শুধু তুচ্ছ সিপাহী বিদ্রোহ নাম দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি স্বয়ং বলেছিলেন, এ বিদ্রোহ নয়, স্বাধীনতার লড়াই। সে তথ্য এখনো পাওয়া যাবে বিলেতের পার্লামেণ্টের রেকর্ডে,

পাওয়া যাবে কার্ল মার্কসের বইতে। কার্ল মার্কস তখন ইংলণ্ডে একজন সাংবাদিক। এই যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্য তিনি প্রতিদিন উদগ্রীব হয়ে থাকতেন।

এই পবিত্র মহাযুদ্ধের প্রথম নেতা বিঠোরের নানা সাহেব। বাজি রাও-এর দত্তক পুত্র নানা সাহেব দেশের সমস্ত শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য চিঠি লিখলেন বিভিন্ন রাজা ও নবাবদের, গোপনে দেখা করলেন অনেকের সঙ্গে। তিনি তাঁর ওয়াজির-এ আজম আজিমুল্লা খানকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। আজিমুল্লা খান ধুরন্ধর লোক। সব দেখে শুনে এসে তিনি জানালেন, ইংরেজরা শুধু ব্যবসার মতলোবে আসেনি। এরা রাজ্যশাসন করতে চায়। বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরি, দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। অতএব যুদ্ধ ছাড়া পথ নেই। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রতি জানানো হলো আনুগত্য। ৩১শে মে ১৮৫৭—সেই দিন শুরু হবে দেশ জুড়ে একসঙ্গে লড়াই। সিপাহীদের ব্যারাকে ব্যারাকে ভিখিরি আর সন্যাসী আর ফকিররা নিয়ে যায় হাতে-গড়া রুটি আর রক্তকমল। তারা সেই রুটি একটু-খানি ছিঁড়ে খায়, ফুলের গন্ধ শোঁকে—দেশমাতার জন্যে তখনই শপথ নেওয়া হয়ে যায়।

কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের আগেই, কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে চৌত্রিশ নম্বর রেজিমেন্টের এক সিপাহী লাগিয়ে দিল তুলকালাম কাণ্ড। ২৯শে মার্চ, প্যারেড গ্রাউণ্ডে সিপাহীরা রোজকার মতন জমায়েত হয়েছে, হঠাৎ গুলিভরা বন্দুক উঁচুতে তুলে মঙ্গল পাণ্ডে বললো, ভাইওঁ, উঠো, ম্যায় আপ কো ভারত মা-কো সৌগন্ধ দিলাতা হুঁ। *স্বাধীনতা পুকার রহি হ্যায় কি হাম হামারে দাগাবাজ দুশমনকো খতম কর দে! ইসলিয়ে উঠো!*

মঙ্গল পাণ্ডের কথা শুনে অন্য সিপাহীরা উত্তেজিত কিন্তু বিমূঢ়। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। সেইসময় সার্জেন মেজর হিউসন বিপদের

গন্ধ পেয়ে তাড়াতাড়ি হুকুম দিল, সোলজার্স, ক্যাপচার মঙ্গল পাণ্ডে!

কোনো সিপাহী এগিয়ে এলো না। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে। মঙ্গল পাণ্ডে সোজাসুজি ঘুরে দাঁড়ালো সার্জন মেজরের দিকে। ওর অন্তরাত্মা ওকে বললো, পাণ্ডে, হিউসনকে খতম করে দাও।

এক মুহূর্ত দেরি না করে বন্দুক চালালো মঙ্গল পাণ্ডে। হিউসন দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

তখন দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো লেফটেনাণ্ট ব। তাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে পাণ্ডে গুলি চালিয়ে দিল সেদিকে। গুলি লাগলো ঘোড়ার গায়, ঘোড়াসুদ্ধ লেফটেনাণ্ট আছড়ে পড়লো মাটিতে। তাড়াতাড়ি উঠেই লেফটেনাণ্ট ব গুলি করে মারতে গেল পাণ্ডেকে, নিশানা ঠিক হয়নি, সে গুলি পাণ্ডের গায়েও লাগলো না। তখন দুজনেই কোমরবন্ধ থেকে টেনে বার করলো তলোয়ার। একজন অত্যাচারী দলের প্রতিনিধি, আর একজন স্বাধীনতার সৈনিক। পাণ্ডের বলিষ্ঠ হাতের তলোয়ার ভেদ করে দিল লেফটেনাণ্ট-এর হৃৎপিণ্ড।

এরপর এলেন কর্নেল হুইলার। তিনি আবার সিপাহীদের হুকুম দিলেন, ক্যাপচার হিম!

সিপাহীরা এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল এই দৃশ্য। কর্নেলের হুকুম শুনে এক মুহূর্ত তারা চুপ করে রইলো। পরের মুহূর্তেই বলে উঠলো, আমরা কোনো ভারতীয় সিপাহীর গায়ে হাত দেবো না!

শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল পাণ্ডে। ৮ই এপ্রিল সে ফাঁসীর মঞ্চে উঠে পেয়ে গেল ভারতের প্রথম শহীদের সম্মান। জন্মালে সব মানুষই একদিন না একদিন মরে। কিন্তু এইসব মানুষ অমরত্বের সিংহাসনে স্থান পায়। মঙ্গল পাণ্ডের অসম সাহসিকতা দেখে ইংরেজ এমনই

ধাক্কা খেয়েছিল যে এরপর তারা যে-কোনো বিদ্রোহী সিপাহী দেখলেই বলতো, ঐ আর একজন মঙ্গল পাণ্ডে আসছে।

পাণ্ডের বীরত্ব দেখে দেশের সাধারণ মানুষও বুঝতে পারলো, ঐ টুপিওয়ালা সাদা চামড়ার মানুষগুলো সর্বশক্তিমান নয়।

এর পর বাংলায়, পাঞ্জাবে, উত্তর প্রদেশে ছড়িয়ে পড়লো লড়াই। ১০ই মে মীরাট দখল হয়ে গেল। তক্ষুনি বিজয়ী সৈন্যরা ছুটলো দিল্লির দিকে। ১১ই মে দিল্লি মুক্ত, বাহাদুর শা আবার স্বাধীন ভারতের সম্রাট। দেশের চতুর্দিক থেকে সৈন্যরা ইংরেজ নিধন করতে করতে এগোতে লাগলো দিল্লির দিকে। সবার মুখে এক কথা, দিল্লি চলো, দিল্লি চলো—।

কিন্তু তখন ভারতে পাতা হয়েছে নতুন রেল লাইন। ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত গতিতে ব্রিটিশ সৈন্য চলে আসতে পারে এক শহর থেকে আরেক শহরে। ইংরেজ জানে, দিল্লি উদ্ধার করতে না পারলে সমস্ত এশিয়া থেকেই তাদের বিদায় নিতে হবে।

১৩৩ দিন মুক্ত ছিল দিল্লি নগরী। কিছুদিন মানুষ পেয়েছিল স্বাধীনতার স্বাদ। রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতন মানুষ এরপর থেকে উন্মুখ হয়ে রইলো সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য।

দিল্লি পতনের পর বাহাদুর শা জাফর আশ্রয় নিয়েছিলেন হুমায়ুনের সমাধি ভবনে। ইংরেজ সেখান থেকে টেনে বার করলো সেই আটাত্তর বছরের বৃদ্ধকে। পাতলা কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা মস্ত বড় থালা তাঁর সামনে রেখে ব্যঙ্গ করে বললো, এই নিন, জাঁহাপনার নজরানা।

কম্পিত হাতে বৃদ্ধ সেই কাপড়ের ঢাকনা সরালেন। দেখলেন, সেখানে রয়েছে তাঁর দুই ছেলের ছিন্নমুণ্ড। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন ভাগ্যহীন সম্রাট কবি। তখন পাশ থেকে এক ইংরেজ দালাল তাঁকে বললো, অনেক বকবকানি হয়েছে, এখন নিজের জান বাঁচাবার

চেষ্টা দেখো ? ওহে জাফর' এখন হিন্দুস্থানের তরোয়াল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে :

তুম তুমায়ে দম নেহি, আব খায়ের মানো জান কি
আয় জাফর, ঠাণ্ডি হুয়ি আব তেগ হিন্দুস্থান কি।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে বাদশা তাকালেন সেই অর্বাচীনের দিকে। তারপর তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন, পরবর্তী নব্বই বছর ধরে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সে কথা মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছে। তিনি বললেন, যতদিন দেশের প্রতি একটুও শ্রদ্ধা অবশিষ্ট থকেবে মানুষের, ততদিন পর্যন্ত আমাদের তলোয়ার লণ্ডনের দিকে চলবেই।

গাজিও মে বু রহেগি যব তলক ইমান কি
তব তো লন্দন তব চলেগি তেগ হিন্দুস্থান কি।

এই মহাযুদ্ধের আগুনে যথাসর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শ্রীমন্ত নানা সাহেব, রাও সাহেব, বালা সাহেব পেশোয়া, তাঁতিয়া টোপি, রানী লক্ষ্মীবাঈ, মৌলভী আহমদ শা, বাবু কুমার সিং, বাবা সাহেব নরগুন্দ আর হাজার হাজার নাম না জানা সিপাহী। এই যুদ্ধের পরাক্রম দেখে আফগানিস্তান, পারস্য এবং এশিয়ার অন্য কয়েকটি দেশে ইংরেজের আক্রমণ পরিকল্পনা থমকে গিয়েছিল।

সিপাহী যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর শুরু হলো নির্যাতন। সারা দেশ জুড়ে ইংরেজ যে নৃশংস নির্যাতন চালিয়েছে তার উদাহরণ ইতিহাসে খুব বেশী নেই। এই বর্বরতার অভিযান গোপন করার জন্য সিপাহীরা কোথায় কোথায় ইংরেজদের হত্যা করেছে ইংরেজ লেখকরা সেইসব কথাই ফলাও করে লিখেছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের স্কুল-পাঠ্য ইতিহাসে এখনও সেইসব কাহিনীই পড়ানো হয়।

এর পর কুড়ি পঁচিশ বছর ভারতীয়রা শান্ত হয়েছিল। শান্ত হয়েছিল কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েনি। গোপনে গোপনে চলছিল প্রস্তুতি পর্ব। এই সময়ের মধ্যেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে

উঠেছে এখানে সেখানে। মহারাষ্ট্রে বাসুদেও বলবন্ত ফড়কে, পাঞ্জাবে রাম সিং কুকা, মণিপুরে টিকেন্দ্রজিৎ সিং, বিহারে বিরসা মুণ্ডা ইতিহাসের স্মরণীয় নাম।

বাসুদেও ফড়কে ছিলেন একজন সামান্য কেরানী। অত্যাচারী ইংরেজের স্বরূপ বুঝতে পেরে তিনি শুরু করে দিলেন স্বাধীনতার সংগ্রাম। প্রথমে তিনি আখড়া তৈরী করে যুবকদের ব্যায়াম ও অস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগলেন। তারপর পার্বত্য আদিবাসীদের নিয়ে তৈরী করলেন সৈন্যবাহিনী, বিভিন্ন দিক থেকে এক সঙ্গে আক্রমণ চালালেন ইংরেজদের ওপর। ফড়কে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রধান পথিকৃৎ, তিনিই প্রথম স্বাধীন জাতীয় সরকারের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

ফড়কে ইংরেজের চোখে এতই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যে ইংরেজ তার মাথার দাম ঘোষণা করলো চার হাজার টাকা। এই ইস্তাহার লটকে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ফড়কে পাল্টা ইস্তাহার দিলেন যে, বোম্বাইয়ের গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল-এর মাথা যে আনতে পারবে, তাকে দেওয়া হবে চার হাজারের ওপর আরও তিন হাজার টাকা।

ফড়কে বিদ্যুৎ গতিতে বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়ে ইংরেজের মনে ত্রাস সৃষ্টি করছিলেন, হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন মহীশূর রাজ্যের এক মন্দিরে। ইংরেজ তাঁকে ভারত থেকে সরিয়ে নিয়ে এডেন বন্দরের কারাগারে আটকে রাখলো, সেখান থেকেও পালাবার চেষ্টা করেছিলেন ফড়কে, আবার ধরা পড়ে গেলেন, শেষ পর্যন্ত এডেনেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ফড়কের ব্যায়ামের আখড়ায় একজন তরুণ যুবক ব্যায়াম করতে আসতেন। পরবর্তীকালে তিনিই বাল গঙ্গাধর টিলক নামে ভারত বিখ্যাত হন। যাঁকে সকলেই বলেছিলেন, বিদ্রোহী ভারতের জনক।

টিলক বুঝেছিলেন যে, ইংরেজদের আঘাত হানার আগে দরকার জন সংহতি। জাতীয়তাবোধ না জাগলে এ জাতি জাগবে না। মহারাষ্ট্রে তিনি প্রবর্তন করলেন শিবাজী উৎসব এবং গণেশ উৎসব।

১৮৯৬ সালে এই রকম এক উৎসবে টিলক সভাপতি। বিভিন্ন বক্তা স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটি যুবক উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললো, বক্তৃতা দিয়ে যারা স্বাধীনতা আনতে চায়, তারা সব হিজড়ে!

এক মুহূর্তের জন্য সবাই স্তম্ভিত। তারপরই সভা থেকে ছেলেটিকে বার করে দেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। শুধু টিলক ছেলেটিকে আড়ালে ডেকে বললেন, তুমি তো সবাইকে নপুংসক বললে। কিন্তু এদেশে যদি সত্যিকারের কোনো পুরুষমানুষ থাকতো তা হলে অত্যাচারী ইংরেজ অফিসার র‍্যাণ্ড এখনো বেঁচে থাকতো না।

ছেলেটি এই কথা শুনে চুপচাপ চলে এলো। ছেলেটির নাম দামোদর হরি চাফেকর। দরিদ্র চিৎপাবন ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, বাবা একজন কীর্তনীয়া। চাফেকররা তিন ভাই, তিনজনেই বাবার সঙ্গে খোল কর্তাল নিয়ে কীর্তন গায়, আবার গোপনে গোপনে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি তৈরী করেছে। গোপন ক্লাব স্থাপন করে অল্পবয়েসী ছেলেদের অস্ত্র শিক্ষা দেয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে। কারুর কাছ থেকে কোনো প্রেরণা না পেয়েই চাফেকর ভাইরা কি করে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল, তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এরকম বিস্ময়কর ব্যাপার বার বার ঘটেছে বলেই এই জাত মরেনি।

টিলকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো চাফেকর ভাইরা। পুনার ইংরেজ অফিসার র‍্যাণ্ড-এর অত্যাচারে সাধারণ মানুষ তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। সেই সময় মহারাষ্ট্রে চলছে প্লেগের তাণ্ডব, তার চেয়েও ভয়াবহ র‍্যাণ্ডের তাণ্ডব। সেই র‍্যাণ্ডের নিয়তি চলে গেল চাফেকরদের হাতে।

১৮৯৭ সালের বাইশে জুলাই। সেদিন রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জয়ন্তী। শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে চলছে প্রচুর আমোদ প্রমোদ আর খানাপিনা। আর সারাদিন ধরে কয়েকটি ছেলে ছায়ার মতন র‍্যাণ্ডের গাড়ির পেছন পেছন ঘুরে তার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। দামোদরের পরের ভাইয়ের নাম বালকৃষ্ণ, সে আরও বেশী দুঃসাহসী। একেবারে ছোটভাই বাসুদেও। সঙ্গে আছে রানাডে আর সাঠে নামে আরও দুজন।

পুণার গণেশখিণ্ডে, এখন যেখানে পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে তখন ছিল গভর্ণরের বাড়ি। রাত সাড়ে আটটার সময় দামোদর, বালকৃষ্ণ, রানাডে আর সাঠে দুটি পিস্তল আর দুটি তলোয়ার নিয়ে উপস্থিত হলো সেখানে। তলোয়ার দুটো পাগড়িতে মুড়ে রেখে এলো একটা গাছের পেছনে। গণেশখিণ্ডের কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ছোটভাই বাসুদেও, র‍্যাণ্ডের গাড়ি চিনতে পারলে সে সঙ্কেত দেবে। সঙ্কেত আগে থেকেই ঠিক করা আছে, 'গোন্দ্যেয়া আলা রে আলা'।

অপেক্ষা করতে করতে রাত বারোটা বাজলো, তখন শোনা গেল কয়েকটা গাড়ির শব্দ। কোন গাড়িটা র‍্যাণ্ডের তা চেনা যাচ্ছে না। বাসুদেও কোনো সঙ্কেত দেয়নি। এদিকে বালকৃষ্ণ ছটফট করছিল, এর মধ্যেই হুবহু র‍্যাণ্ডের গাড়ির রঙের মতন একটা গাড়ি এসে পড়লো সামনে। বালকৃষ্ণ আর দেরী না করে লাফিয়ে উঠলা সেই গাড়ির পেছনে, পিস্তল ঢুকিয়ে দিয়ে গুলি চালালো। কিন্তু এ গাড়ি ছিল লেফটেনাণ্ট আয়ার্স্টের। তখন চতুর্দিকে বাজি ফাটছে, স্বামীর পাশেই বসে ছিলেন মিসেস আয়ার্স্ট, তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি, হঠাৎ তাকিয়ে দেখেন তাঁর স্বামী রক্তে ভাসছে। ভয় পেয়ে তিনি কোচোয়ানকে বললেন, গাড়ি থামাও। কোচোয়ানের নাম আপ্পা গোপাল, সে ইংরেজি বোঝে না, ঘোড়াগুলোও ভয় পেয়ে গেছে— গাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল।

কাজ সেরে প্রসন্নমুখে পিস্তলের নল মুছতে মুছতে বালকৃষ্ণ দাদার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দূরে শোনা গেল, 'গোন্দ্যেয়া আলা রে আলা'।

বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো দামোদর সামনের গাড়ির ওপর। তার আগে ভাইকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বললো, ওয়াসা, বাজুলা হো! তারপর গাড়ির পেছনের পর্দা জোর করে সরিয়ে পিস্তলটা র‍্যাণ্ডের একেবারে ঘাড়ের কাছে ঠেকিয়ে পুরো পিস্তল খালি করে দিল।

আর একটা গাড়িতে ফ্রান্সিস লুই নামে আর একজন ইংরেজ রাজপুরুষ ছিল, সে তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে নেমে এলো—ততক্ষণে বিপ্লবীরা অদৃশ্য হয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র এক টা নির্জন জায়গায় কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে মিলিয়ে গেল শহরের ভিড়ে। দামোদর সেই রাত্রেই পুণা থেকে চলে গেল বোম্বাই। পরদিন সকালে আবার বাবার সঙ্গে করতাল বাজিয়ে কীর্তন গাইতে লাগলো। বালকৃষ্ণ আশ্রয় নিল হায়দ্রাবাদে।

ঐ ঘটনার পরদিন সকালে সাঠে টিলকের সঙ্গে দেখা করে বললো, কাল রাত্রে গণেশখিণ্ডের গণেশ আমাদের ওপর প্রসন্ন হয়েছেন।

টিলক হাসিমুখে বললেন, ভালো, খুব ভালো। কিন্তু তোমরা সাবধানে থাকবে।

সরকার এদের ধরার জন্য কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। দুজন দ্রাবিড় ভাই-এর বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে যায় দামোদর এবং বালকৃষ্ণ। ফাঁসীর হুকুম হয় দুজনেরই। তৃতীয় ভাই বাসুদেও তখনও বাইরে, মাত্র সতেরো বছর তার বয়েস, পুলিস তাকে সন্দেহ করেনি। তবু রোজ তাকে একবার করে থানায় যেতে হয়। একদিন বাসুদেও বুঝতে পারলো, তাকে রাজসাক্ষী করার চেষ্টা হচ্ছে।

নিজের দাদাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে বাসুদেও? এই সিংহ শিশুকে পুলিস চেনেনি। দাদাদের সঙ্গেই সে মিলিত হবে, তার আগে সম্পন্ন করবে নিজের কাজ। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিয়ে যাবে।

রাতের অন্ধকারে বাসুদেও আর মহাদেব রানাডে মুখোশ পরে এসে দাঁড়ালো সেই দ্রাবিড় ভাইদের বাড়ির সামনে। এখন সেখানে পুণার নাগনাথ পার্ক। গলার আওয়াজ অন্যরকম করে তারা দ্রাবিড় ভাইদের ডেকে বললো, আপনাদের থানা থেকে ডাকছে, আপনাদের পুরস্কারের টাকা নেবেন না? দ্রাবিড় ভাই দুজন তাশ খেলছিল, তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলো। বাড়ির বাইরে সবে মাত্র দু'এক পা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো পিস্তল। দুজন বিশ্বাসঘাতকের লাশ পড়ে রইলো রাস্তায়।

ফাঁসীর হুকুম হবার পর ছোটভাই বাসুদেও বলেছিল, দুজনকে মেরেছি, আমার দু'বার ফাঁসী হবার কথা। কোনটা আগে হবে? বালকৃষ্ণ ফাঁসীর হুকুম শুনে বলেছিল, ঠিক আছে, ঠিক আছে! দামোদর বলেছিল, আর বেশী কিছু শাস্তি নেই? মহাদেব রানাডে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হাসাহাসি করেছিল।

ইয়েরাওডা জেলে ফাঁসী হয় এই তিন ভাই এবং রানাডের। সেই জেলেই আর এক সেলে বন্দী ছিলেন টিলক। ভোরবেলা ফাঁসীর মঞ্চে যাবার আগে দামোদর চাফেকর প্রণাম করলো টিলককে। টিলক তার হাতে তুলে দিলেন একখণ্ড ভগবদ গীতা। তারপর দামোদর তার ভাইদের উদ্দেশ্যে বললো, বালকৃষ্ণ, বাসুদেও, তবে আসি? রাম রাম!

ওরা উত্তর দিল, দাদা, তুমি যাও। আমরাও আসছি।

এরা তিন ভাই-ই বিবাহিত ছিল। একজনের ছিল একটি ছেলে আর মেয়ে। আর একজনের শুধু একটি মেয়ে। তাদের মধ্যে দুজন এখনো বেঁচে আছে। শুধু ভারতবর্ষে কেন, সারা পৃথিবীতে একই

পরিবারের তিন বিবাহিত ভাই এক সঙ্গে ফাঁসীর দড়িতে প্রাণ দিয়েছে—এমন আর দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে গুপ্তহত্যা অবশ্যম্ভাবী—চাফেকর ভাইরা তার সফল সূত্রপাত করে গেলেন।

যে দিন দামোদরকে ফাঁসী দেওয়া হলো সেই রাত্রে মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ভগুর গ্রামে একটি তের বছরের ছেলে একা ঘরে তলোয়ার দিয়ে নিজের আঙুল কেটে শপথ নিল, তোমাদের পবিত্র কাজ শেষ না করা পর্যন্ত আমি শান্তির মুখ দেখবো না!

চাফেকরদের রক্ত থেকে উঠে আসা এই ছেলেটির নাম বিনায়ক দামোদর সাভারকর।

২

চাঁপা ফুলের গন্ধ যেমন বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে, সেই রকম চাফেকর ভাইদের আত্মত্যাগের প্রেরণা ছড়িয়ে পড়লো ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে। বাংলার যুবশক্তি তখন ক্রোধে ফুঁসছে, বিস্ফোরণ হতে আর দেরি নেই।

বাংলা চিরকালই দুর্জয়। শত অত্যাচার উৎপীড়নেও বাঙালীর প্রতিবাদ স্পৃহা দমানো যায়নি। প্রথম প্রথম ইংরেজ শাসনের ওপর দিকে ভদ্র আবরণের জন্য ভেতরে ভেতরে লুকোনো নিষ্ঠুর শোষণ যন্ত্রটি বাংলার শিক্ষিত সমাজের চোখে পড়েনি, কিন্তু দেরি হয়নি সে ভুল ভাঙতে।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দোল্লা একবার কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সমুদ্রের দিকে। পলাশীর যুদ্ধে মোহনলাল ও মীরমদনের বীরত্বের কথা আমাদের চিরদিন মনে থাকবে। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় লুণ্ঠিত হলো স্বাধীনতা—কিন্তু সেই মীরজাফরেরই জামাই মীরকাশিম আত্মসম্মান রক্ষার জন্য শেষ ধাক্কা দিয়ে গিয়েছিলেন এই বিদেশী শক্তিকে। অন্যায়ভাবে ফাঁসী দেওয়া হলো মহারাজ নন্দকুমারকে, নন্দকুমার শান্ত ভাবে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন ইংরেজের আইন কানুনের বড়াই কত মিথ্যে।

যে ভারতের দারিদ্র্য আজ সারা পৃথিবীর আলোচ্য বিষয়, সেই ভারতেরই ঐশ্বর্যের লোভে একদিন সারা পৃথিবী থেকে ছুটে এসেছিল দস্যুর মত বিদেশীরা। ভারত তথা এশিয়ার লুণ্ঠিত সম্পদে ইওরোপের

দেশগুলি ধনবান হয়ে উঠেছে, বিলাসিতায় আড়ম্বরে গা ভাসিয়েছে—ওদেশের কবি শিল্পীরা নিজেদের উন্নতি নিয়ে গর্ব করেছে, এমনকি গেয়েছে মানবতার জয়গান—কিন্তু প্রাচ্যের কোটি কোটি মানুষের ওপর তাদের জাত-ভাইরা যে কি অত্যাচার চালাচ্ছে সে কথা একবারও মনে পড়েনি। বরং, নিজেদের বিবেককে সান্ত্বনা দেবার জন্য তারা প্রচার করেছে যে এশিয়াবাসীরা অশিক্ষিত, বর্বর—তাদের মুক্তিদাতা রূপে এসেছে ইওরোপীয়রা।

এদেশের বিদ্বদ্‌সমাজ এক সময় উপলব্ধি করলেন, ভারতবর্ষের জ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্যের সম্ভার তুলে ধরে দেখাতে হবে যে শুধু সোনাদানা হীরেজহরতেই নয়, আত্মিক সম্পদেও এই দেশ কত উঁচুতে। এবং শুধু বিদেশীদের নয়, জানাতে হবে আত্মবিস্মৃত ভারত-বাসীকেও। জাতীয়তাবোধ এবং নিজের দেশের জন্য গর্ববোধ না থাকলে স্বাধীনতা বহু দূরে থেকে যাবে। বাংলাদেশে সেই জাতীয়তা-বোধের উদ্বোধন করলেন রাজা রামমোহন। শিক্ষা জগতে এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ঠাকুর বাড়ির ছেলেরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও স্বদেশীআনাকে গৌরব দিলেন। ধর্মভেদ ঘোচাবার জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বললেন, যত মত, তত পথ। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ কবিরা লিখলেন স্বদেশ বন্দনার গান। বঙ্কিম দিলেন সারা দেশকে এক উদ্দীপনার মন্ত্র, বন্দে মাতরম্।

বিদেশে ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ফিরে এসে তিনি বুঝলেন, এ দেশের মানুষ যদি মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার না পায়, তা হলে ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। এই খেতে না-পাওয়া, অসুখে-ভোগা মানুষগুলোর কাছে ধর্ম তো আফিমের মতন। ধর্মচর্চার বদলে তিনি বললেন শরীর চর্চা করতে। এমন কি,

সেই যুগে তিনি এ কথাও বুঝেছিলেন যে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া এ দেশ স্বাধীন হবে না। তাঁর ছোট ভাই প্রখ্যাত বিপ্লববাদী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'বিবেকানন্দ, সেইন্ট, প্যাট্রিয়ট অ্যাণ্ড পোয়েট' নামের বইতে লিখেছেন যে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার জন্য স্বামীজী দেশীয় রাজাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই রুদ্র সন্ন্যাসী এ দেশের মানুষকে জাগাবার জন্য প্রচার করলেন তাঁর স্বদেশমন্ত্র :

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পর মুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য সর্বত্যাগী উমানাথ শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারানসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশিনী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। এই মহিয়সী নারী শুধু আধ্যাত্ম তত্ত্বের দিকেই আকৃষ্ট ছিলেন না, ইনি আয়ারল্যাণ্ডের সন্ত্রাশবাদী কার্যকলাপের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এক সময়। তাঁর নিজের দেশ যেমন ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই চালিয়েছে, ভারতেও তিনি সেই রকম সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। নিবেদিতার প্রেরণায় বাংলায় স্থাপিত হলো গুপ্ত সমিতি, তিনি নিজে যুবকদের অস্ত্র শিক্ষায় উৎসাহ দিতে লাগলেন।

বাংলার যুব মানস যখন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, তখন তাঁদের নেতৃত্ব দিতে এলেন একজন কালজয়ী মহাপুরুষ। যাঁকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

বন্ধন-পীড়ন দুঃখ-অসম্মান-মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান
মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত, চির প্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঝঙ্কার
নাহি তাহে দুঃখ তান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্ঝা-সাথে সিন্ধুর গর্জন
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণ পিঞ্জর টুটি বজ্র গর্জরব
ভেরিমন্ত্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

ধ্যানী, কবি, আন্তর্জাতিক চিন্তানায়ক শ্রীঅরবিন্দ ইংলণ্ড থেকে স্বদেশ ফেরার পর বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন। এবং সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া পথ নেই। তিনি প্রথমে বরোদার মহারাজার আমন্ত্রণে সেখানকার কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেছিলেন—৭৫০৲ টাকা বেতনে। সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন কলকাতায়—এখন যেখানে যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়, সেখানে তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ন্যাশনাল কলেজ—অরবিন্দ মাত্র ১৫০৲ টাকা বেতনে গ্রহণ করলেন তার অধ্যক্ষ পদ। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন বন্দেমাতরম পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। অচিরে তিনি পড়লেন রাজরোষে।

লর্ড কার্জন দেশের সমস্ত মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন ১৯০৫ সালে। এক হিসেবে সেটা হয়েছিল আশীর্বাদের মতন। সেই উপলক্ষে যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়, তাতে জাতীয়তাবোধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। প্রথম শুরু হলো বিদেশী দ্রব্য বয়কট, এদেশের লোক কলকারখনা স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। বন্দোমাতরম অর্থাৎ 'মা তোমায় প্রণাম' এই নিরীহ কথা দুটি উচ্চারণ করলেই পুলিস বেত মারতে আসে কিংবা কারাগারে নিক্ষেপ করে। তার ফলে লোকে আরও বেশী করে বলে। সেই থেকে বন্দেমাতরম একটা মন্ত্র হয়ে গেল। জাতীয় পত্রিকাগুলি প্রচার করতে লাগলো, আঘাতের বদলা আঘাত দিতে হবে। রক্ত না দিলে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না।

এবার প্রয়োজন অস্ত্র সংগ্রহ। দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মোন্নতি সমিতি নামে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছে। অনুশীলন সমিতি আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে একদল যুবক বোমা বানাবার তোড়জোড় করতে লাগলো। বোমা তৈরী কৌশল শেখবার

জন্য একজনকে পাঠানো হলো খোদ ইংলণ্ডে। সেই লোকের নাম হেমচন্দ্র দাস।

সেই সময়ে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নামে একজন ধনী দেশপ্রেমিক লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের থাকবার সব ব্যবস্থা করে দিতেন নিজের খরচে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তলে তলে ঐ সব ছাত্রদের স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া। তখন বীর সাভারকরও ইংলণ্ডে। তিনি সেনাপতি বাপোট আর হেমচন্দ্রের যোগাযোগ করিয়ে দিলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে। কৃষ্ণবর্মা এদের দুজনকে পাঠালেন ফ্রান্সে, সেখানে এক রাশিয়ান মহিলার কাছ থেকে অত্যন্ত গোপনে শিখে নিলেন বোমার গুপ্তিমন্ত্র।

কলকাতার মানিকতলায় হেমচন্দ্র আর উল্লাসকর বানালেন প্রথম বোমা। সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। প্রফুল্ল চক্রবর্তী বোমাটি নিয়ে গেলেন দেওঘরে। ডিগরিয়া পাহাড় খুব নির্জন, অগম্য স্থান—সেখানে বোমাটি ফাটানো হলো। কিন্তু দেখা গেল বোমাটি যতখানি শক্তিশালী মনে করা হয়েছিল, তার চেয়েও এর শক্তি অনেক বেশী। বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে প্রফুল্ল চক্রবর্তী মারা গেল সেখানেই। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডিগরিয়া পাহাড়ে শোনা গিয়েছিল ভারতে তৈরী প্রথম বোমার ভয়াল শব্দ। প্রফুল্ল নিজের প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেল,তার সার্থকতা।

পরের বোমাটি তৈরী করার পর বিপ্লবীরা চিন্তা করলো, এটা পরীক্ষা করার জন্য নির্জন পাহাড়ে যাবার দরকার কি? কোনো ইংরেজের ওপর মেরে দেখলেই তো হয়। নির্বাচন করা হলো কিংসফোর্ডকে।

কিংসফোর্ড তখন বাংলার সবচেয়ে কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট। আইনের রক্ষক হয়েও তিনি বিচারের সময় শুধু প্রহসন করতেন। বন্দেমাতরম মামলায় অরবিন্দ ঘোষ এঁরই এজলাসে আসামী। এই কিংসফোর্ডই বিপিনচন্দ্রকে অরবিন্দর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য জুলুম করেছিলেন।

এই বিচারের সময়েই আর একটা ঘটনা ঘটে। সুশীল সেন নামে একটি পনেরো বছরের ছেলে আদালতের বাইরে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল—এই সময় শ্বেতাঙ্গ দারোগা অকারণে জনতার ওপর লাঠি চালাতে শুরু করে। সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সুশীল সেন এগিয়ে এসে দারোগার মুখে এক ঘুঁষি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। তখন একসঙ্গে আরও তিন চারজন পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটির ওপর, মারতে মারতে তাকে নিয়ে আসে আদালতে।

হাকিম কিংসফোর্ড সুশীল সেনকে দেখে ব্যঙ্গ করে বললেন, বাঙালী ছেলেরা কি ভেবেছে, তারা পুলিসেরও গায়ে হাত তুলবে? ঠিক আছে পনেরো ঘা চাবুক কষাও একে।

মাত্র পনেরো বছরের বালককে চাবুক মারার দণ্ড পৃথিবীর কোনো সভ্য আদালত কখনো দেয় না। সুশীল সেন তার মুখের একটা রেখাও না কাঁপিয়ে খেয়ে গেল সেই চাবুক। সারা দেশ ধিক্কার জানালো কিংসফোর্ডকে। সুশীল সেনকে নিয়ে মিছিল বেরুলো কলকাতা শহরে। সরকার ভয় পেয়ে কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল মজঃফরপুরে। বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত নিল এই কুখ্যাত হাকিমের ওপরেই পরীক্ষা করতে হবে স্বদেশী বোমা।

ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী নামের দুই কিশোর এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে চলে এলো মজঃফরপুরে। উঠলো একটা ধর্মশালায়। সাতদিন অপেক্ষা করতে হলো তাদের, কারণ কিংসফোর্ড তখন ভয়ে ভয়ে বাড়ি থেকে বেরুতেই চান না।

১৯০৮ সালের তিরিশে এপ্রিল রাত আটটার সময় ঐ দুই কিশোর এসে দাঁড়িয়ে রইলো কিংসফোর্ডের বাংলোর সামনে। ক্ষুদিরামের দুই পকেটে দুই পিস্তল, হাতে বোমা। প্রফুল্ল আর এক পিস্তল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। ওদের কাছে নিশ্চিন্ত খবর আছে যে ক্লাব বাড়িতে কিংসফোর্ড আর তাঁর পত্নী তাশ খেলছেন। রাত সাড়ে

আটটার সময় ক্লাব থেকে ঠিক একই রকম দুটি বগি গাড়ি বেরিয়ে এলো। প্রথম গাড়িটি দেখেই ওরা বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে। ক্ষুদিরাম প্রফুল্লর দিকে চোখের ইশারা করে জানালো যে বোমা যদি না ফাটে তা হলে রিভলবার দিয়ে আক্রমণ চালাতে হবে। বগিগাড়িখানা কিংসফোর্ডের বাড়ির গেটের সামনে আসতেই ক্ষুদিরাম বোমাসুদ্ধু হাতখানা মাথার ওপর তুলে সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারলো, প্রচণ্ড শব্দে বোমাটা ফাটলো গাড়ির ওপর—সেখানাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল। সেই শব্দ শুনেছিল সমস্ত শহরের লোক। ভারতের বিপ্লবীদের তৈরী সেই প্রথম বোমা আঘাত করলো বিদেশী শক্তিকে।

কাজ সমাপ্ত হয়েছে ভেবে আত্মরক্ষার জন্য ছুটলো ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল। তখন অবশ্য ওরা বুঝতেও পারেনি যে কিংসফোর্ডের বদলে ওরা মেরেছে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি নামে দুই মহিলাকে। তাড়াতাড়িতে ওরা পায়ের জুতো সেইখানেই ফেলে যায়—বাকিটা পথ খালি পায়ে যাওয়াই ওদের পক্ষে কাল হয়েছিল।

দুজনে ছুটতে ছুটতে কিছুদূর যাবার পর আলাদা হয়ে গেল ওরা। প্রফুল্ল গেল সমস্তিপুরের দিকে। সেখান থেকে মোকামাঘাটের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়লো। ইতিমধ্যে সে জামা কাপড় বদলে নিয়েছে। কিন্তু বুকের মধ্যে অসম্ভব তৃষ্ণা। একটু জল না খেয়ে সে আর থাকতে পারছে না। সেমুরিয়াঘাট স্টেশনে নেমে দেখলো কোথাও জলের কল নেই—দৌড়ে চলে গেল কাছাকাছি গঙ্গার ঘাটে। নদী থেকে যখন সে চুমুক দিয়ে জল খাচ্ছে তখন দেখলো পাশে আর একটি লোকের ছায়া।

এই লোকটির নাম নন্দলাল ব্যানার্জি। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই লোকটি প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করছিল—এক মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। নন্দলাল ব্যানার্জি পুলিসের একজন সাব ইনস্পেকটর—ছুটির পর যোগ দিতে যাচ্ছিল চাকরিতে।

প্রফুল্লকে দেখে তার সন্দেহ হয়। ততক্ষণে প্রত্যেক রেল স্টেশনে পুলিস পাহারা বসে গেছে। মোকামাঘাট স্টেশনে নন্দলাল ব্যানার্জি প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করার জন্য জড়িয়ে ধরলো। প্রফুল্লর গায় অসম্ভব শক্তি, সে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে গেল প্ল্যাটফর্মের অন্যদিকে। দুজন সেপাই তাড়া করে গেল তাকে। পালাবার রাস্তা বন্ধ দেখে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়লো। ততক্ষণে একজন সেপাই তার হাত চেপে ধরেছে। উপায়ান্তর না দেখে প্রফুল্ল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের গলায় পিস্তলের নল ঠেকিয়ে দু'বার গুলি ছুঁড়লো। মৃত্যু আসতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না। বাংলার প্রথম প্রকাশ্য শহীদ পুলিসের হাতে ধরা দেয়নি। পুলিসের হাত ছাড়িয়ে প্রফুল্ল চলে গেল সেইখানে যেখানে 'সম্রাট ও ভিখারী, বিপ্লবী কিংবা শাসক সম্প্রদায় সমান বিচার পেতে পারে'।

প্রফুল্ল চাকীর পরিচয় তখনও কেউ জানতো না। সেইজন্য তার মুণ্ডটা দেহ থেকে কেটে আলাদা করে স্পিরিটে ডুবিয়ে পাঠানো হলো কলকাতায়। নন্দলাল ব্যানার্জি ইনাম পেল এক হাজার টাকা। বিপ্লবীরা অবশ্য তাকে ছাড়েনি। প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুর ঠিক আট মাস আটদিন পর কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় বিপ্লবীরা তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং তাদের কেউ ধরা পড়েনি।

এদিকে ক্ষুদিরাম রেল লাইনের পাশ দিয়ে দিয়ে চব্বিশ মাইল পথ দৌড়ে যায় সারা রাত ধরে। তারপর পৌঁছোয় ওয়েইনি স্টেশনে। সাঙ্ঘাতিক পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত কিশোর তখন ভাবলো তার সব বিপদ কেটে গেছে। ট্রেন আসতে তখনও দেরি আছে—স্টেশনের কাছেই বাজারে সে গেল খাবারের সন্ধানে। তখন সকাল আটটা। তার খালি পা, চুল উস্কোখুস্কো, উদভ্রান্ত চেহারা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো পুলিসের। এক গেলাস জল নিয়ে সে সবে মাত্র চুমুক দিতে যাচ্ছে সেই সময়েই ধরা পড়ে গেল। কোটের পকেট থেকে সে

রিভলবার টেনে বার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এক সঙ্গে তিন চারজন জড়িয়ে ধরে তাকে। ক্ষুদিরামের মুখে তখন ফুটে উঠলো অদ্ভুত ধরনের হাসি। এরপর থেকে কেউ তার মুখে একটুও ভয়ের চিহ্ন দেখেনি—সেই হাসিটুকু অম্লান ছিল।

হাসি হাসি পরবো ফাঁসী
দেখবে জগৎবাসী
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি!

বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার পর জজ তাকে জিজ্ঞেস করে'ছিলেন দণ্ডাদেশ সে বুঝতে পেরেছে তো? মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যাঁ বলে সে আবার হেসেছিল। যেন এতে তার কিছুই যায় আসে না।

দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নেবো মাসীর ঘরে মা গো
চিনতে যদি না পারিস মা
দেখবি গলায় ফাঁসী
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি!

ফাঁসীর সময় ক্ষুদিরামের বয়েস হয়েছিল মাত্র সতেরো। পনেরো বছর বয়সেও সে একবার নিষিদ্ধ ইস্তাহার বিলি করার অপরাধে পুলিসের হাতে ধরা পড়েও হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। আদালতে সে বলেছিল তার বোমার আঘাতে দুজন মহিলার মৃত্যু একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কিন্তু ভারতবাসীর শত্রু কিংসফোর্ড'কে সে সজ্ঞানে মারতে গিয়েছিল এবং এ সম্পর্কে তার মনে কোনো গ্লানি নেই। ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট ভোর চারটায় ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়। তার ফাঁসীর সময়কার বর্ণনা দিয়েছেন তার উকিল উপেন্দ্রনাথ সেন। তিনি লিখেছেন যে ক্ষুদিরামের মুখের ভাব এমন ছিল যেন সে ফাঁসীতে যাচ্ছে না, সে তার দু'পাশের পুলিস দুজনকেই ফাঁসীতে চড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। এ দেশের নবীন যৌবনের প্রতীক হয়ে সে উন্নত মস্তকে উঠে

গেল ফাঁসীর মঞ্চে। তার মুখ যখন কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়, তখনও সে হেসেছিল।

হাসি হাসি পরবো ফাঁসী
দেখবে জগৎবাসী
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি!

মজঃফরপুরের ঘটনার পরই পুলিস বিপ্লবীদের সন্ধানে সারা দেশ তছনছ করে ফেলে। কলকাতার মানিকতলা, মুরারিপুকুর এবং অন্যান্য জায়গা থেকে বোমার মালমশলা সমেত অনেক কাগজপত্র পুলিসের হাতে পড়ে। সবসুদ্ধ গ্রেপ্তার হয় ৩৮ জন—এদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এবং স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ।

মজঃফরপুরে বোমার আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় বারীন্দ্রনাথ ঘোষ তরুণ দলের নেতা হিসেবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে আদালতে বিচারের সুযোগ নিয়ে তাঁরা সমস্ত দেশবাসীকে তাঁদের কাজ ও উদ্দেশ্যের কথা জানাবেন। আদালতে বিচারের কাহিনী সমস্ত সংবাদপত্রে ছাপা হবেই—সেই সূত্রে তাঁদের দেশ-উদ্ধার ব্রতের কথা সমস্ত লোকের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। সুতরাং বিচারের সময় তাঁরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার বদলে হাকিমের সামনে ঘন ঘন বন্দেমাতরম ধ্বনি এবং হাসি ঠাট্টা হৈ হল্লা করতে লাগলেন। এরা তো মরতে কেউ ভয় পায় না। বারীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতকহস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে বুঝি এ মরণভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না।"

কিন্তু দলের একজন সদস্যের সঙ্গে এই নিয়ে মতভেদ হলো। নরেন গোঁসাই দল ছেড়ে রাজসাক্ষী হয়ে দলের সমস্ত গোপন কথা এবং প্রচুর মিথ্যে কথা বলতে লাগলো। নরেনের প্রতিটি উক্তিই বিপ্লব পন্থার

পক্ষে ক্ষতিকর—অতএব নরেনকে আর বাঁচতে দেওয়া যায় না। নরেনকে জেলখানা, আদালত এবং পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন কানাই দত্ত আর সত্যেন বসু। জেলখানার মধ্যেও ওঁরা দুজন কি করে রিভলবার আমদানি করলেন সে এক রহস্য! অনেকে বলেন, ওরা বাইরে থেকে কাঁঠালের মধ্যে ভরে রিভলবার এনেছিলেন।

নরেন গোঁসাইকে তখন আলাদাভাবে ইওরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। কানাই আর সত্যেন অসুখের ভান করে ভর্তি হলো হাসপাতালে এবং নরেনের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করলো। এমন ভাব দেখালো যে ওরাও রাজসাক্ষী হয়ে শাস্তি এড়াতে চায় এবং এ জন্য নরেনের সাহায্য দরকার। একদিন সকাল সাতটার সময় তারা দুজনে নরেনের সঙ্গে গোপন কথা বলবার জন্য জেল-হাসপাতালের এক ওয়ার্ডে এসেছে—বাইরে পাহারা দিচ্ছে ইওরোপীয় রক্ষী হিগিনস্। কোনো কথা না বলেই ওদের একজন গুলি ছুঁড়লো নরেনের দিকে। গুলি লাগলো নরেনের বাহুতে। সে চেঁচিয়ে উঠল, বাঁচাও, বাঁচাও, এরা আমাকে মেরে ফেলবে! ছুটে এলো হিগিনস্—কানাই গুলি মেরে তাকে আহত করে ধাওয়া করলো নরেনকে। নরেন তখন সিঁড়ি দিয়ে পালাচ্ছে। কানাই আর সত্যেন বাঘের মতন তাকে তাড়া ক'রে গেল। আর একজন ইওরোপীয়ান ওয়ার্ডার এসে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও কানাই শেষ গুলিতে নরেনকে খতম করে ফেলে দিল বাগানের পাশে নর্দমায়।

বলাই বাহুল্য, কানাই আর সত্যেন—দুজনেরই ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। অনেকেই বলেছিল, ওদের আপিল করতে। কানাই দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়েছিল, There shall be no appeal!

সারা দেশ তখন এই দুই যুবকের পরিণতির কথা ভেবে উদ্বেলিত। কানাইয়ের ঐ উক্তি শুনে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিদারুণ শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছিলেন, "কানাই শিখিয়ে গেল হে, Shall আর Will-এর ব্যবহার করতে কেউ আর ভুল করবে না!"

ফাঁসীর দিন রাত্রে কানাই এমন ঘুমিয়ে ছিল যে ভোরবেলা তাকে ঠ্যালাঠেলি করে জাগাতে হয়। ঘুম থেকে উঠে সে লঘু গলায় বলেছিল, ও, আজকেই নাকি? চলো তা হলে।

কানাইয়ের মৃতদেহ নেবার জন্যে ভোরবেলাতেই হাজার হাজার মানুষের এক জনতা অপেক্ষা করছিল জেলখানার বাইরে। কানাই খেলোয়াড়ের মতন সাবলীলভাবে ফাঁসীর দড়ি গলায় নিয়েছিল—এবং শেষবারের মতন বলে গিয়েছিল, তার মৃতদেহ নিয়ে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দরকার নেই। সে ওসব বিশ্বাস করে না। [এর আগে ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী এসেছিলেন সত্যেনকে আশীর্বাদ করতে—কারণ সত্যেন ছিল ব্রাহ্ম। শিবনাথ শাস্ত্রী ফিরে আসার পর অনেকে শিবনাথ শাস্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিল, আপনি সত্যেনকে আশীর্বাদ করলেন, কানাইকে কেন আশীর্বাদ করলেন না? উত্তরে পণ্ডিত শিবনাথ বলেছিলেন, "সে পিঞ্জরবদ্ধ সিংহ! বহু তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে।"]

কানাইয়ের মৃতদেহ জনতার হাতে তুলে দেবার সময় ইংরেজ কারারক্ষী জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, বলতে পারো, কানাইয়ের মতন ছেলে তোমাদের দেশে আর ক'জন আছে?

কানাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রায় সমস্ত কলকাতা শহর উত্তাল হয়ে ওঠে—সেই জন্যই জেল কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে সত্যেনের মৃতদেহ আর জনতার হাতে দেয়নি। ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্সের ক্যাপটেন বীর সত্যেন বসুর দেহ গোপনে পুড়িয়ে ফেলা হয় জেলখানার মধ্যে।

নরেন গোঁসাইকে হত্যার অনেকগুলি সুফলের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে ব্রিটিশ সরকার শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। সেই সময় নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই মনে করেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দের মতন একজন প্রেরণাদাতার জেলের বাইরে

থাকা বিশেষ দরকার। কারণ, তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, অরবিন্দ ঘোষ—যিনি বিলেতে লালিত পালিত, ইংরেজি শিক্ষায় অভ্যস্ত—তিনি যে ভারতে এসে শুধু স্বদেশী মন্ত্র নিয়েছেন তাই-ই নয়, তিনি যে বিপ্লবে প্রেরণা দিচ্ছেন তাও শেষ কথা নয়—তিনি এসবের চেয়েও অনেক বড়। Long after he is dead and gone he will be looked upon as a poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India but across distant seas and lands. I say, that the man in his position is not only standing before the bar of this Court, but before the High-court of History.

এই কথাগুলো বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের পক্ষের ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ—পরবর্তীকালে যিনি দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশবন্ধু হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দর মামলায় সারা ভারতবর্ষ উদগ্রীব হয়েছিল এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আগুন জ্বালা ভাষায় প্রমাণ করেছিলেন দেশকে ভালবাসা কোনো অপরাধ নয়।

চিত্তরঞ্জন দাশের বাগ্মিতায় এবং নিপুণ যুক্তির জালে দিশেহারা হয়ে ইংরেজ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। সারা দেশ উল্লাসে ফেটে পড়লো। যেন এ জয় শুধু অরবিন্দের নয়, শুধু চিত্তরঞ্জনের নয়, সমস্ত ভারতবাসীর।

শ্রীঅরবিন্দের মামলার সূত্রেই চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বিলাসী জীবন এবং বিপুল উপার্জন পরিত্যাগ করে সমস্ত সত্তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশের কাজে। এবং পরবর্তীকালে তিনিই নিজের হাতে গড়ে তোলেন সুভাষচন্দ্র বসুকে। চিত্তরঞ্জনের নিজের ছেলে অকালে মারা যায়, তাই সুভাষকেই তিনি পুত্রবৎ স্নেহে স্বাধীনতার পূজারী

হবার মন্ত্র দিয়েছিলেন। ওদিকে উত্তর প্রদেশে, চিত্তরঞ্জনের বন্ধু পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং তাঁর ছেলে জওহরলালও এসেছিলেন দেশ-সেবায়। মুসলমান সমাজ থেকে এসেছিলেন বিদগ্ধশ্রেষ্ঠ আবুল কালাম আজাদের মতন মানুষ—এবং কিছুকালের জন্য এদের সকলকে নিয়ে সমন্বয় সাধন করেছিলেন গান্ধীজী।

এবার শুনুন আর একটি বাচ্চা ছেলের কথা। এই ছেলেটি সারা ভারতের শত শত বীর বিপ্লবীদের মধ্যে একজন—আজ যাদের কোনো স্মৃতি চিহ্নও আমরা রাখিনি। তাদের সকলের কথা আমরা শোনাতে পারব না—তবু এই ছেলেটির কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি—কারণ তার ঘটনা এক দিক থেকে অনন্য।

ছেলেটির নাম চারুচন্দ্র বসু। রোগা পাতলা চেহারা। কতই বা বয়েস, কুড়িও পেরোয়নি। সে কোথায় থাকে, কি করে কেউ জানে না। কিছুদিন নাকি সে ছাপাখানায় কাজ করেছিল। কাজ করার পক্ষে তার অসুবিধা আছে। তার ডান হাতখানা জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ, ডান হাতের তালুও নেই, আঙুলও নেই। ডান হাতে সে কোনো কিছু ধরতে পারে না। তবু ঐ হাতে সে পিস্তল ধরেছিল।

আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা থেকেই আশু বিশ্বাস বাংলার একটি ঘৃণিত নাম। আশু বিশ্বাস ছিল সরকারের পাবলিক প্রসিকিউটার। সরকারের কাছ থেকে বাহবা নেবার জন্য সে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের ছলে বলে কৌশলে কঠিন কঠিন শাস্তি দেবার জন্য মন প্রাণ নিযুক্ত করেছিল। এমনকি মিথ্যে দলিল পত্র সাজাতেও তার দ্বিধা ছিল না—দেশের লোককে শাস্তি দিতে পারলেই তার আনন্দ।

এই আশু বিশ্বাসকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার দায়িত্ব চারু নিজেই নিজের ওপর নিয়েছিল। কে তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, কে দিয়েছিল পিস্তল—তা কেউ জানেনা। ১৯০৯-এর ১০ই ফেব্রুয়ারি চারু তার পঙ্গু ডান হাতখানায় একটা পিস্তল দড়ি দিয়ে বেঁধে নিল ভালো

করে। তারপর গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে আলিপুর কোর্টের প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বিকেল চারটে কুড়ির সময় আশু বিশ্বাস যেই ম্যাজিস্ট্রেটের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, চারু তার গায়ের চাদরখানা খুলে ফেলে ডান হাতখানা সামনে বাড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে পিস্তলের ট্রিগার টিপলো। আশু বিশ্বাস বাপ রে মা রে বলে চিৎকার করে ছুটেছে—চারু তাকে দৌড়ে তাড়া করে পিঠের সঙ্গে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে আবার চালালো গুলি। আশু বিশ্বাস লাট্টুর মতন ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ে মরে গেল।

পুলিস প্রহরীরা সেখানেই তাকে ধরে ফেলে। তারপর নির্মম ভয়ংকর অত্যাচারেও চারু মুখ খোলেনি। কারুর নাম বলেনি, পুলিসকে কোনো সূত্র পাওয়ারও সুযোগ দেয়নি। ম্যাজিস্ট্রেটকে সে বলেছিল, কোনো সাক্ষী-প্রমাণের দরকার নেই, কোনো বিচারেরও দরকার নেই। আমাকে কাল কিংবা সম্ভব হলে আজই ফাঁসী দিন। দেশের শত্রু আশু বিশ্বাসকে আমি মারবো—এটাও যেমন ঠিক করা ছিল, তেমনি ইংরেজের হাতে আমার ফাঁসী হবে—এটাও ঠিক করা আছে।

ফাঁসী হয়ে গেল চারুর। অনেকে হয়তো আগে তাকে দেখে ভাবতো—এই বিকলাঙ্গ পঙ্গু ছেলেটার জীবনে কিছু হবে না। কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে সে জীবন সার্থক করে গেল।

৩

মহারাষ্ট্র ও বাংলায় যখন বিস্ফোরণ ও রক্তপাত চলছে, তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জাগ্রত হচ্ছে জনমত। এবার আমরা জাগতে দেখছি পাঞ্জাবকে। রণদুর্মদ পাঞ্জাবী ও শিখরা ১৮৫৭ সালের সিপাহী অভ্যুত্থানের সময় অংশগ্রহণ না করে দূরে সরে ছিল—কিন্তু পরবর্তী-কালে দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা নেতৃত্ব ও রক্ত দিয়েছে অনেক। এই সময়েই ইংরেজ বিরোধী প্রচারের জন্য লালা লাজপৎ রায় এবং সর্দার ভগৎ সিং-এর কাকা সর্দার অজিত সিং নির্বাসন দণ্ড পেয়েছেন।

এঁদের কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে একজন তরুণ পাঞ্জাবী যুবক এলো লণ্ডনে। দেশে ফেলে রেখে এল তার অল্প বয়সী বউ আর একটি বাচ্চা ছেলেকে। যুবকটি লণ্ডনে এসে ভর্তি হলো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্য, কিন্তু বুকের মধ্যে তার দেশপ্রেমের আগুন। এই যুবকের নাম মদনলাল ধিংড়া।

লণ্ডনে তখন বীর সাভারকর, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, লালা হরদয়াল, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিকরা প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছিলেন। সাভারকর মদনলাল ধিংড়াকে একটি গুরুতর কাজের জন্য বেছে নিলেন।

ব্রিটিশ সরকারের সেক্রেটারি অফ স্টেট লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রদের তদারকি করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটির একজন সদস্য কার্জন ওয়াইলি। এর আসল কাজ ছিল ভারতীয় ছাত্রদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করা। এই কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এবং খোদ লণ্ডন শহরের ওপরেই।

মদনলাল প্রথমে এসে উঠেছিল ইণ্ডিয়া হাউস হোস্টেলে। কিন্তু যাতে সেখানকার সমস্ত ভারতীয় ছাত্রকেই পুলিসের হাতে নাজেহাল হতে না হয় সেইজন্যে সাভারকর মদনলালকে সরিয়ে আনলেন সেখান থেকে। লডবেরি রোডে মিস রোজ নামে এক মহিলার বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হলো ধিংড়া। এই মিস রোজ আবার কার্জন ওয়াইলির সেক্রেটারি। সেই সূত্রে ওয়াইলির সঙ্গেও প্রত্যক্ষ আলাপ পরিচয় হয়ে গেল ধিংড়ার। তার বাড়িতে সে গল্পসল্প করতেও যায়।

এ দিকে সে হ্যাটেন গার্ডেন পোস্ট অফিস থেকে পিস্তলের লাইসেন্স করে নিয়েছে। পিস্তল নিয়ে গোপনে রেওয়াজ করলো তিনমাস। এবার সে প্রস্তুত। কার্জন ওয়াইলির বাড়িতে গিয়ে এক একবার তার মনে হয়েছিল, গলা টিপেই ওকে মেরে ফেলবে। কিন্তু সাভারকরের নির্দেশ ছিল, ওকে মারতে হবে প্রকাশ্য জনসভায়— যাতে ভারতের স্বাধীনতার আওয়াজ লণ্ডন পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

১৯০৯ সালের পয়লা জুলাই—ইমপিরিয়াল ইনস্টিটিউটে এক সভায় আসবে কার্জন ওয়াইলি। সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই বেরিয়ে পড়লো মদনলাল ধিংড়া। তার সঙ্গে সাভারকরের দেওয়া একটি ব্রাউনিং পিস্তল, নিজের আর একটা পিস্তল—তবু এর পরেও রজার্স এণ্ড সন্স কোম্পানি থেকে সে কিনে নিল বারো ইঞ্চি একখানা ছোরা। তরুণ যুবা মদনলাল ধিংড়া, তার অঙ্গে নিখুঁত সাহেবী পোশাক, খুবই শৌখিন সুপুরুষ। ক্লাবে সে কায়দার সঙ্গে নাচতে জানে—তার ভারতীয় বন্ধুরা তাকে বিদ্রূপ করতো এই জন্য! ইণ্ডিয়া হাউস হোস্টেল ছেড়ে সে যখন এক মেমসাহেবের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে চলে গিয়েছিল, তখন সবাই তাকে বলেছিল বিশ্বাসঘাতক। কেউ কেউ ওকে মেরে ফেলার কথাও বলেছিল—সাভারকর বাধা দিয়েছিলেন মাঝপথে।

ঠিক সময়ে মদনলাল সভাগৃহে উপস্থিত। গান বাজনার অনুষ্ঠানের

পর এক সময় দেখা গেল কার্জন ওয়াইলি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। মদনলাল ঠিক তার সামনে গিয়ে তার নাকের ডগায় পিস্তল ছুঁইয়ে পর পর পাঁচ গুলি দেগে দিল। কার্জন ওয়াইলির মুখখানা এমন ছিন্ন-ভিন্ন বিকৃত হয়ে গেল যে তার নিকট আত্মীয়রাও দেখে তাকে চিনতে পারবে না।

গুলি খেয়ে যখন কার্জন ওয়াইলি পড়ে যাচ্ছে তখন পাশ থেকে এক পার্শী ভদ্রলোক—যার নাম কাওয়াসজী লালকাকা—ছুটে এলো সাহেবকে বাঁচাতে—ধিংড়ার ষষ্ঠ গুলি ফুঁড়ে গেল লালকাকার দেহ।

তারপর ধিংড়া হাতের পিস্তল ফেলে চেঁচিয়ে বললো, কারুর কোনো ভয় পাবার দরকার নেই। সে আর কারুর ক্ষতি করবে না।

দুজন পুলিস দু'দিক থেকে ঘিরে ধরলো ধিংড়াকে। একজন তার হাত চেপে ধরতেই ধিংড়া অসীম বিদ্রূপের সঙ্গে বললো, আমার হাত ছেড়ে দাও! আমাব কোটের ইস্তিরি খারাপ হয়ে যাবে।

ওখানে উপস্থিত সমস্ত লোকের বুক ভয়ে তখনও ধড়ফড় করছে। কিন্তু ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেছিল, ধিংড়ার পালসের গতি একে-বারে স্বাভাবিক। বিচারের সময় সে জজের উদ্দেশ্যে বলেছিল, আমাকে নিয়ে তোমরা যা খুশি করতে পারো। তোমরা শ্বেতাঙ্গরা এখন সর্বশক্তিমান। কিন্তু জেনে রেখো, একদিন আমাদেরও দিন আসবে।

জেলে সাভারকর গিয়েছিলেন ধিংড়াকে দেখতে। মানুষ যেমন দেব দর্শনে যায়, সেইরকমই সাভারকর তাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে 'দর্শন' করতে এসেছি। তোমার কিছু চাইবার আছে?

ধিংড়া সকৌতুকে বলেছিল, ইংরেজের কৃপায় সবই তো এখানে আছে। শুধু টাইয়ের নট্ ঠিক আছে কিনা সেটা দেখবার জন্য একটা আয়নার বড় অভাব বোধ করছি।

ফাঁসীর মঞ্চে ওঠার সময়ও ধিংড়া কালো কাপড় মুখের ওপর দেয়নি। সে পালিশ করা জুতো ও নিভাঁজ স্যুট পরে সেজে গুজে

মরতে গেছে। ১৯০৯ সালের ১৭ই আগস্ট—লণ্ডনের পেণ্টনভিল জেলে ধিংড়ার ফাঁসী হয়ে গেল। মৃত্যুর আগে সে নিজের স্ত্রী ও পুত্রের কথা একবারও উল্লেখ করেনি—শুধু বারবার অনুরোধ করেছে—তার পকেটে যে ঘোষণা পত্র পাওয়া গেছে—সেটি যেন প্রকাশ করা হয়।

কি সেই ঘোষণা পত্র? ধিংড়ার কোটের পকেটে এবং তার ঘরে ঐ ঘোষণা পত্রের দুটি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সে তো জ্বলন্ত আগুন, সেই আগুনকে ছড়িয়ে দেবে—লণ্ডনের পুলিস কি এতই নির্বোধ? পুলিস অতি সাবধানে সে ঘোষণা পত্র তালাবন্ধ করে রেখেছিল।

তবু ধিংড়ার ফাঁসীর আগের দিনই সেই ঘোষণা পত্র ছাপা হয়ে গেল লণ্ডনের ডেইলি নিউজ সংবাদ পত্রে। কি করে এটা সম্ভব হলো? ঐ ঘোষণা পত্রের রচনার পিছনে ছিলেন স্বয়ং সাভারকর। তিনি তখন ফ্রান্সে, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার 'ইণ্ডিয়ান সোসালিস্ট' কাগজে প্রকাশ করে দিলেন সেই বয়ান। ওঁর এক সঙ্গী জ্ঞানচন্দ্র বর্মাকে তার এক কপি দিয়ে গোপনে পাঠিয়ে দিলেন লণ্ডনে। তিনি আবার চুপি চুপি ওটাকে রেখে এসেছিলেন এক খবরের কাগজের নাইট এডিটরের টেবিলে।

সেই ঘোষণা পত্র পড়ে স্বয়ং চার্চিল বলেছিলেন, এমন জ্বলন্ত ভাষায় স্বদেশ ভক্তির নিদর্শন তিনি আগে দেখেননি।

লয়েড জর্জ বলেছিলেন, এই এক স্টেটমেণ্ট পড়ে গোটা মহাদেশ কেঁপে উঠবে।

এই সেই বয়ান:

Sir,

I admit the other day I attempted to shed English blood as a humble revenge for the in human hangings and deportations of patriotic Indian youths.

In this attempt I have consulted none but my own conscience. I have conspired with none but my own duty.

I believe that a nation held down by foreign beyonets is in a perpetual state of war. Since open battle is rendered impossible to a disarmed race, I attacked by surprise, since guns were denied to me I drew forth my pistol and fired...... The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to teach it is by dying ourselves; therefore, I die and glory in my martyrdom......ইত্যাদি।

মদনলাল ধিংড়ার ব্যক্তিগত বীরত্বে ইংরেজরা বুঝেছিল— লণ্ডন শহরেও তাদের প্রাণ নিরাপদ নয়। ভারতের নানা স্থানে ইংরেজের ওপরে তো আক্রমণ হচ্ছেই—এই বীর যুবকরা লণ্ডনে এসে সংগ্রাম চালাতেও ভয় পায় না। এদিকে ইংরেজভক্ত ভারতীয়রা নির্যাতনের ভয়ে লণ্ডন শহরে এক মিটিং ডেকে কার্জন ওয়াইলির হত্যার নিন্দা করে এক প্রস্তাব আনতে গেল। বীর সাভারকর প্রচণ্ড প্রতিবাদ করলেন সেই প্রস্তাবের। সাভারকরের প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত মারামারি ধস্তাধস্তিতে পরিণত হচ্ছিল। সাভারকরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন সরোজিনী নাইডুর ভাই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'দি টাইমস' সংবাদপত্রে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন, এই রকম হত্যার তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ হবে।

এরপর পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে সাভারকর এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আত্মগোপন করলেন ফরাসীদেশে।

পাঞ্জাবের পর আবার মহারাষ্ট্রের দিকে তাকানো যাক। মহারাষ্ট্রের

দেশব্রতী যুবকেরা "অভিনব ভারত" নামে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের সংঘবদ্ধ করছিল জেলায় জেলায়। কিন্তু সর্বাত্মক সংগ্রামের প্রস্তুতির আগেই একটি ঘটনায় তারা অস্থির হয়ে উঠলো, বাধ্য হলো আত্মপ্রকাশ করতে।

বীর বিনায়ক সাভারকরের দাদা গণেশ দামোদর সাভারকর একটি সর্বশ্রদ্ধেয় নাম। বস্তুত, সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়ই ছিলেন অভিনব ভারতের প্রাণপুরুষ। বিনায়ক সাভারকর বিদেশ থেকে গোপনে ২০টি পিস্তল পাঠিয়েছিলেন এঁদের কাছে। গণেশ সাভারকর ছিলেন এঁদের উপদেষ্টা। পুলিস একবার একটু সুযোগ পেয়েই গ্রেফতার করলো গণেশ সাভারকরকে। তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনো প্রমাণ না পেয়ে শুধু একটি দেশাত্মবোধক কাব্য রচনার অভিযোগেই দিয়ে দিল যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড। একটি কবিতার বই প্রকাশ করার অপরাধে এরকম শাস্তি দেবার উদাহরণ আছে কোন্ সভ্য দেশে? "অভিনব ভারতের" ছেলেরা ক্রোধে জ্বলে উঠলো—তারা ঠিক করলো ঐ ম্যাজিস্ট্রেটকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেটের নাম জ্যাকসন। মুখে খুব মিষ্টি কথা। ভারতীয়দের সঙ্গে খুব মেলামেশার ভান করে, কিন্তু মনে মনে ভীষণ ঘৃণা করে এই জাতটাকে। তবু অনেক ভারতীয় তার বহিরঙ্গ দেখেই মুগ্ধ হতো। জ্যাকসনকে যখন নাসিক থেকে বদলি করা হয়েছিল—তখন নাসিকের কিছু ব্যক্তি তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য একটি নাটকের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল পর্যন্ত।

নাসিক থেকে অনেক দূরে ঔরঙ্গাবাদের একটি বাড়িতে বসে বিপ্লবীরা গোপনে আলোচনা করছিল। নিজেদের মধ্যে তারা প্রশ্ন করছিল, জ্যাকসন হত্যার ভার কে নেবে? কার আছে এত সাহস?

সেই বাড়িতে থেকে একটি গরীবের ছেলে কোনোক্রমে নিজের পড়াশুনো চালাচ্ছিল। সে সেই গোপন আলোচনা শুনতে পেয়ে

বললো, আমি পারি এ কাজ। এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য সে জ্বলন্ত লণ্ঠনের ওপর হাত মেলে ধরলো, মুখের একটাও রেখা কাঁপালো না।

ছেলেটির নাম অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে।

কানহেরেকে ঔরঙ্গাবাদ থেকে নিয়ে আসা হলো নাসিকে। কানহেরে আগে কখনও পিস্তল ছুঁয়ে দেখেনি। তার শিক্ষার ভার নিল বিনায়ক দেশপাণ্ডে আর কৃষ্ণগোপাল কার্ভে। রাত্তিরে একটা ইস্কুল বাড়ির মাঠে চললো সুটিং প্র্যাকটিস। তারপর এলো সেই নির্দিষ্ট দিন।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯০৯। নাসিকের বিজয়ানন্দ থিয়েটারে জ্যাকসনের সম্বর্ধনা। অভিনীত হচ্ছে নাটক 'সারদা'। বালগন্ধর্ব নিজে সারদার অভিনয় করছেন। কানহেরে আগে থেকেই টিকিট কিনে একেবারে সামনের দিকে এসে বসে আছে চুপচাপ। তার পকেটে একটা ব্রাউনিং পিস্তল, কোমরে গোঁজা আর একটা রিভলবার।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে কোদণ্ডের ভূমিকায় অভিনেতা যোগেলকার একটি গান গাইতে গাইতে সত্ত মঞ্চে এসেছেন। ঠিক তখনই নিজের স্ত্রী আর কিছু অফিসার পরিবৃত হয়ে প্রবেশ করলো জ্যাকসন। কানহেরে এমনই উত্তেজিত যে আর এক মুহূর্তও সে দেরি করলো না। উঠে দাঁড়িয়েই গুলি চালালো। লাগলো না সেই গুলি। কানহেরে তখন দৌড়ে গিয়ে জ্যাকসনের বুকে রিভলবার ঠেকিয়ে শেষ করে দিল চেম্বার। জ্যাকসনের শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। প্রাণ বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

বিচারের সময়, ব্যারিস্টার এম আর জয়াকার রোজ শুনতে যেতেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, I used to attend Kanheres trial at the high court and was struck with the fact that while the trial was going on, he took

no notice of it, asked no questions and answered none, being the whole time busy with something in his hand.

কানহেরের সঙ্গে সঙ্গে কার্ভে ও দেশপাণ্ডেরও ফাঁসীর হুকুম হয়ে যায়। ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে খুব সংক্ষিপ্ত ভাষণে কানহেরে বলেছিল যে আদালতের বিচারে ভারতবাসীর প্রাণের কোনো দাম নেই, সেখানে ব্রিটিশের প্রাণ নেওয়াই আমাদের পাল্টা বিচার। জ্যাকসনকে হত্যা করার পবিত্র দায়িত্ব যে আমার ওপর পড়েছিল, সেজন্য আমি ধন্য।

এরপর আমরা তাকিয়ে দেখি দক্ষিণ ভারতের দিকে। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সংকল্প ছড়িয়ে পড়েছে সেখানেও। ত্রিবাঙ্কুরে, টুটিকোরিনে স্থাপিত হয়েছে ভারত মাতা অ্যাসোসিয়েশন। এর সদস্যেরা দীক্ষা নিচ্ছেন স্বদেশী মন্ত্রের—সংগঠন ও প্রচারের মাধ্যমে এঁরা দেশবাসীকে সজাগ করতে চান। "ফিরিঙ্গী নাশিনী" প্রেস তৈরী করে এঁরা গোপনে 'বন্দেমাতরম' নামে ইস্তাহার ছড়াচ্ছেন তামিল ভাষায়।

টুটিকোরিন-এ এই ভারত মাতা অ্যাসোসিয়েশনের এক গোপন সভায় ওয়াংচি আইয়ার নামে একজন কেরানী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "শুধু আলাপ আলোচনায় কি হবে? শ্বেতাঙ্গদের শাসনের ফলেই আজ এ দেশের কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে মরছে—দুর্ভিক্ষে দারিদ্র্যে দেশ ছেয়ে গেছে। এখন শ্বেতাঙ্গদের খুন করে তাদের হাত থেকে স্বরাজ ছিনিয়ে নিতে হবে!"

ওয়াংচি আইয়ার নিজেই প্রথম দায়িত্ব নিলেন এই সশস্ত্র আক্রমণের। অন্ধ্র প্রদেশের গ্রামে গ্রামে ইস্তাহার ছড়িয়ে দিলেন, ওরে, ব্রিটিশ কুকুল্লারা, এ অন্ধ্রভূমি বোদিলে পেণ্ডিরা—অর্থাৎ, ব্রিটিশ কুকুর, এই অন্ধ্রভূমি ছেড়ে চলে যা! তিনি অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ছুটতে লাগলেন এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে এবং দিকে দিকে গুপ্ত

সমিতি স্থাপন করতে লাগলেন ইংরেজ তাড়াবার ব্রত নিয়ে। শাসক সমাজের কোনো প্রতিনিধিকে সমুচিত শিক্ষা দেবার ভারও নিলেন তিনি নিজেই।

তিনিভেলি জেলার কালেক্টর তখন রবার্ট অ্যাশ। দেশের বড় বড় নেতাদের জেলে পোরাই এঁর প্রধান কাজ। ভারতীয়দের উদ্যোগে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হলেও ইনি বাধা দেন। এই অ্যাশের কাছে পাঠানো হলো এক চরম পত্র :

"আমরা, ভারতমাতা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা তোমাকে এই মর্মে সাবধান করে দিচ্ছি : তুমি আর কখনো কোনো ভারতীয প্রতিষ্ঠানে মাথা গলিও না। যদি এর পরেও তুমি গোয়াতুর্মি করো— তা হলে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে খুব শিগগিরই।"

অ্যাশ সাহেব বোধহয় এই চিঠিখানিকে ঠাট্টা বলেই মনে করে-ছিলেন। কারণ এর পরেও তিনি তাঁর স্বৈরাচারী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন পুরোদমে।

১৯১১ সালের ১৭ই জুন, সস্ত্রীক অ্যাশ সাহেব তিনিভেলি থেকে কোদাইকানলি যাচ্ছেন ট্রেনে চেপে। ট্রেন এসে থেমেছে মানিয়াংচি জংশনে। এখানে ট্রেন বদল করতে হবে—অ্যাশ সাহেব নিজের কামরা থেকে নেমে অন্য প্ল্যাটফর্মে গিয়ে উঠলেন আর একটি গাড়িতে। মালপত্র আসার জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি জানলার পাশে বসে কাগজ পড়ছেন। তখন সকাল এগারোটা।

ওয়াংচি আইয়ার তিনিভেলি থেকেই সেই এক ট্রেনে অনুসরণ করে আসছেন অ্যাশকে। এবার তিনি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে গিয়ে অ্যাশের কামরার জানলার কাছে গিয়ে সোজা গুলি চালালেন। আগেই ওয়াংচিকে দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল অ্যাশের মেম-সাহেব—অ্যাশ হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে নিজের টুপিটা ছুঁড়ে মারলেন তাঁর আততায়ীর দিকে। তার পরেই গুলির আঘাতে ঢলে

পড়ে গেলেন মাটিতে।

ওয়াংচি আইয়ারের পিস্তলে একবার একটিই গুলি ছোঁড়া যায়—তিনি সেখানে দাঁড়িয়েই পিস্তলে আবার গুলি ভরে দেখে নিলেন অ্যাশের গায়ে ঠিক মতন লেগেছে কিনা। অ্যাশকে নীচে পড়ে যেতে দেখে নিশ্চিত হয়ে তিনি দৌড়োতে শুরু করলেন। কিন্তু ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মের বহু লোক তাঁকে তাড়া করতে শুরু করেছে। ওয়াংচি রিভলবার তুলে বললেন, "কেউ কাছে এলেই গুলি করবো—কিন্তু কোনো ভারতবাসীকে আমি মারতে চাই না।" শেষ পর্যন্ত ওয়াংচি আইয়ার প্ল্যাটফর্মের কোণে একটা বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিজের গলায় পিস্তলের নল ঠেকিয়ে গুলি চালিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। এক-জন মহান বীর এইভাবে সত্যরক্ষা করে চলে গেলেন বিদেশী শাসকের বিচারের বাইরে।

কী ঘেতলে ন ব্রত হে অম্হি অন্ধতেনে
লব্ধ প্রকাশ ইতিহাস নিসর্গমানে
যে দিব্যদাহক মন্হুনি. অসাবয়াচে
বুদ্ধ্যাচি বাণ ধরিলে করি হে সতীঞ্চে

[আমরা যে ব্রত নিয়েছি, তা অন্ধ আবেগে নিইনি। ইতিহাস ও প্রকৃতির মধ্যেই এর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যে দিব্য আগুন আমরা ধারণ করেছি, সতীর ব্রতের মতন তা আমাদের স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা।]

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে-কটি বিপ্লবী কার্যকলাপ হয়েছে, তার অনেকগুলির পেছনেই রয়েছে বীর বিনায়ক সাভারকরের সক্রিয় উৎসাহ। বাংলার বিপ্লবীরা যখন বোমা তৈরীর মালমশলা শেখার জন্য একজন প্রতিনিধিকে লণ্ডনে পাঠায়—তখন সাভারকর তাকে সাহায্য করেছিলেন। মদনলাল ধিংড়া সাভারকরের হাতে গড়া ছেলে। আবার মহারাষ্ট্রের "অভিনব ভারত" দলের যুবকদের কাছেও তিনি গোপনে পাঠিয়েছিলেন কুড়িটি রিভলবার। এই জ্বলন্ত পুরুষটি চেয়েছিলেন তখনকার রুশ বিপ্লবীদের মতন সারা ভারতে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে নিজেদের প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। তারপর এক সময় হবে অভ্যুত্থান। কিন্তু তার আগেই সাভারকর ধরা পড়ে গেলেন।

সাভারকর শুধু অস্ত্র সংগ্রহ করতেন না, রণকৌশলও তিনি ঠিক করতেন। এ বিষয়ে তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। এবং এই জন্যই সাভারকরের পক্ষে প্রয়োজন ছিল একটু আড়ালে থাকার। কিন্তু ভারতের

কোনো একজন তরুণ বিপ্লবী নিজের ফাঁসীর হুকুম শোনার পর একটু ক্ষোভের সঙ্গে বন্ধুদের কাছে বলেছিল, সাভারকর আমাদের মরণের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে আড়ালে লুকিয়ে থাকেন!

এই কথা ঘুরতে ঘুরতে একদিন সাভারকরের কানে গেল। তাঁর মতন তেজী পুরুষের পক্ষে একথা সহ্য করা সম্ভব নয়। হঠকারীর মতন তিনি তখুনি নিজের অজ্ঞাতবাস থেকে চলে এলেন লণ্ডনে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে গেলেন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে।

সাভারকরের নামে ভারতে তখন দু' দুটো কেসে ঝুলছে। বিচারের জন্য তাঁকে নিয়ে আসতে হবে ভারতে। কঠোর পাহারায় তাঁকে তোলা হলো মুরিয়া জাহাজে। সাভারকর সাংঘাতিক আসামী —রক্ষীরা এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁকে চোখের আড়াল করে না। এমন কি তাঁর বাথরুমের দরজার মাঝখানেও কাচ বসানো আছে। তিনি বাথরুমে গেলেও রক্ষীরা কাচে চোখ লাগিয়ে নজর রাখে। কিন্তু এত করেও তাঁকে আটকে রাখা গেল না। সাভারকর বাথরুমের দরজা বন্ধ করেই সেই কাচের ওপর তোয়ালে চাপা দিয়ে দিলেন। তারপর পোর্ট হোলের মধ্য দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন সমুদ্রে।

জাহাজ তখন মার্সেই বন্দরের কাছে এসে ভিড়েছে। সাভারকর প্রাণপণে সাঁতরে তীরের দিকে যেতে লাগলেন—ততক্ষণে রক্ষীরা টের পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করেছে। তবু সাভারকর ঠিক পৌঁছে গেলেন।

আগে থেকেই খবর পাঠানো ছিল, সাভারকর এইখানে জাহাজ থেকে পালাবেন। বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং মাদাম কামা আগে থেকেই গাড়ি নিয়ে উপস্থিত থাকবেন সেখানে। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। আসবার পথে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় বীরেন চট্টোপাধ্যায় আর মাদাম কামা ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পারেননি। সাভারকর একজন ফরাসী পুলিসকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমাকে থানায় নিয়ে

চলো। ফরাসী দেশের মাটিতে ইংরেজ আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে না।

ফরাসী পুলিস কিছুই বুঝতে পারলো না। সারা গা ভিজে, একজন বিদেশী মানুষ হাত পা ছুঁড়ে কি বলছে কি? সাভারকর ফরাসী ভাষা ভালো জানতেন না। ততক্ষণে ইংরেজ রক্ষীরা এসে পৌঁছে গেছে। তারা ফরাসী পুলিসকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সাভারকরকে আবার জাহাজে তুললেন। আন্তর্জাতিক কানুন অনুসারে এই কাজটা বে-আইনি। আন্তর্জাতিক আদালতে এই নিয়ে মামলাও উঠেছিল। কিন্তু এশিয়ার কলোনীর ব্যাপারে তখন ইংরেজ আর ফরাসী সরকারের খুব ভাব। একজন ভারতীয় বন্দীকে ইংরেজের হাতে তুলে দিতে ফরাসী সরকার আপত্তি করলেন না। সাভারকরকে এনে ভরা হলো ভারতের জেলে। নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় আলাদা আলাদা ভাবে সাভারকরকে দু'বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলো।

দণ্ডাদেশ শুনে সাভারকর কারারক্ষীকে বললেন, আমার তো জীবন একটাই। দু'বার যাবজ্জীবন দণ্ড ভোগ করবো কি করে?

কারারক্ষী বললো, তুমি এমন সাংঘাতিক অপরাধী যে শুধু এ জন্মে নয়, পরের জন্মেও তোমাকে জেলে পুরে রাখা হবে।

সাভারকর হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন, যাক্ আমার জন্য তা হলে খৃষ্টান ইংরেজদেরও পরজন্মে বিশ্বাস করতে হলো।

বেঁচে থাকলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ হয় পঁচিশ বছর। সেই হিসেব করে সাভারকর পরমুহূর্তেই ব্যঙ্গের সুরে কারারক্ষীকে বললেন, তোমার কি ধারণা, পঞ্চাশ বছর পরেও ইংরেজ এ দেশে টিঁকে থাকবে? দেখা যাক্!

সাভারকর জেলে গিয়েছিলেন ১৯১১ সালে। আমরা জানি, তার পরে আর পঞ্চাশ বছর ইংরেজ এদেশে থাকতে পারেনি।

আন্দামান জেলে কী অসহ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করতে

হয়েছে তাঁকে, তার বিবরণ আছে সাভারকরের আত্মজীবনীতে। তাঁর দাদা গণেশও তখন আন্দামানে। ওঁদের আর এক ভাইও কারারুদ্ধ।

আন্দামান জেলে অধিকাংশ ওয়ার্ডার এবং রক্ষীই ছিল উত্তর ভারতের অশিক্ষিত মুসলমান। এদের নৃশংস উৎপীড়নে অনেক রাজনৈতিক বন্দী আত্মহত্যা করেছে, অনেকে পাগল হয়ে গেছে। অনেকটা এদের জন্যই, দুঃখের বিষয়, সাভারকরের মতন সংস্কারমুক্ত তেজস্বী মানুষের মধ্যেও পরবর্তী জীবনে ধর্মীয় গোঁড়ামি এসে গিয়েছিল।

জেলখানায় বসে তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী, জহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অনেকেই উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু সাভারকর যদিও কবি ছিলেন, তবু তাঁকে এক টুকরো কাগজও দেওয়া হয়নি। তাতেও নিরস্ত হননি তিনি। তাঁর ছোট্ট কুঠরির দেয়ালেই তিনি কাঠকয়লা দিয়ে লিখতে শুরু করলেন একটি গাথা কাব্য। কারারক্ষীরা কিছুদিন অন্তর অন্তর ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেই সেই লেখা মুছে দিয়ে যেত। তার আগেই সাভারকর সেই অংশটুকু মুখস্থ করে ফেলতেন। ঘরের দেওয়াল যেন তাঁর কাছে শ্লেটের মতন। এই ভাবে তিনি সমাপ্ত করেছিলেন 'কমলা' মহাকাব্য —যা মারাঠী ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

১৮৫৭ সালের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াসে সিপাহী অভ্যুত্থানের যে সার্থক ইতিহাস সাভারকর লিখেছিলেন, তা বহুদিন ধরে ভারতীয় মুক্তিকামীদের প্রেরণা জুগিয়েছে। গদর পার্টির লালা হরদয়াল, ভগৎ সিং এবং নেতাজী সুভাষ সেই বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ বার করে প্রচার করেছিলেন।

১৯০৫ সালে ইংরেজ সরকার বাংলাকে দু'ভাগ করতে চেয়েছিল, প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তা পারেনি। ১৯১২ সালে সরকার আবার ঠিক করলো, ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে

দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এবারও বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো, কিন্তু সরকার এবার বদ্ধপরিকর। বাঙালীদের আর বিশ্বাস নেই। তখন প্রায় প্রত্যেক মাসেই বাংলা দেশের কোথাও না কোথাও একটা কিছু ঘটনা ঘটছে। বাঙালী ছেলেরা আর মরতে ভয় পায় না। মৃত্যু-ভয়ের সীমানা যে একবার অতিক্রম করে যায় তার কাছে তো আর কোনো বাধাই বাধা নয়। বাংলার কবি লিখেছেন,

'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘবরন তুঝ, মেঘ জটাজূট,
রক্ত কমল কর, রক্ত-অধরপুট
তাপ বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।'

বাঙালীদের প্রতি ইংরেজ সরকারের ভয় ও অবিশ্বাস ছাড়াও দিল্লীতে রাজধানী পরিবর্তন করার আরও একটি কারণ ছিল। এতকাল মোগল বাদশাহরা দিল্লী থেকে সারা ভারত শাসন করে গেছেন। সেই পরিত্যক্ত সিংহাসনেই ইংরেজ এখন বসতে চায়। যাতে জনসাধারণ এই নতুন রাজার জাতকে ইতিহাসসম্মত কারণেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

ভারতের বড়লাট তখন লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি ঠিক করলেন, দিল্লীতে রাজধানী স্থাপনের প্রাক্কালে রাজকীয় জাঁকজমক ও আড়ম্বরে তিনি মোগলদেরও হার মানাবেন। ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট দিল্লীতে প্রবেশ করছেন বিশাল এক জৌলুসময় শোভাযাত্রা নিয়ে। সামনে পেছনে রয়েছে সারিবদ্ধ সৈনিক, খোলা তলোয়ার হাতে অশ্বারোহীর দল, কামানের গাড়িগুলো টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঘর্ঘর শব্দে। মাঝখানে অনেকগুলো হাতি, সবচেয়ে বড় হাতিটার রূপো মোড়া

হাওদায় বসে আছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর পত্নীর সঙ্গে। ঐতিহাসিক দিল্লীর নাগরিকরা রাস্তার দু'পাশে ভিড় করে দেখছে এই সাদা চামড়ার নতুন রাজার জাতকে।

শোভাযাত্রা এসে পৌঁছেচে চাঁদনি চকে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের বাড়ির ছাদে এক দঙ্গল মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মাঝখান থেকে একটা বোমা টুপ করে পড়লো স্বয়ং হার্ডিঞ্জের হাওদার ওপরে। বিপ্লবীদের সেই একটি মাত্র বোমার প্রচণ্ড শব্দে মিছিলের এত জাঁক-জমক ম্লান হয়ে গেল।

বোমাটি সামান্য একটু স্থানচ্যুত হয়েছিল, লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রাণে মারা গেলেন না বটে কিন্তু শরীরের ছ' জায়গায় আহত হয়েছিলেন এবং পিঠের মাংস কেটে হাড় বেরিয়ে গিয়েছিল। তাঁর পেছনে যে লোকটি ছাতো ধরে দাঁড়িয়ে ছিল সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ছাদ থেকে একটি তরুণী দ্রুত পায়ে নেমে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। এতবড় একটা ঘটনার পর একজনও ধরা পড়লো না। সরকার থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হলো এক লক্ষ টাকা। এর উত্তরে বিপ্লবীরা ইস্তাহার ছড়িয়ে দিল, আমরা সবাই ঈশ্বরের কর্মী। গীতা, বেদ, এবং কোরানে বলা আছে, মাতৃভূমির শত্রুকে খতম করতে হবে। দিল্লীর ঘটনায় প্রমাণ হয়, স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আছেন।

ঐ ঘটনার ছ'মাস পরে আবার লাহোরে গর্ডন নামে একজন অফিসারকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল ঐ বিপ্লবীরা। কিন্তু একটা বোমা একটু আগেই ফেটে যায়। সেই সূত্র ধরে পুলিস খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত দিল্লী-পাঞ্জাবে বিপ্লবী দলের সন্ধান পেয়ে যায়। একে একে ধরা পড়লো অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, বসন্তকুমার বিশ্বাস প্রভৃতি অনেকে। কিন্তু ধরা পড়লেন না শুধু একজন, যিনি ছিলেন এদের নেতা—রাসবিহারী বসু।

পাঞ্জাবে বিপ্লবের বহ্নিশিখা আগেই জ্বলেছিল—এই সময়ে বাংলার সঙ্গে পাঞ্জাবের যোগসূত্র স্থাপন করলেন রাসবিহারী। তিনি অনেকগুলো ভাষা জানতেন—আর এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ ধরতে পারতেন যে দেখলে চেনাই যেত না তিনি কোন প্রদেশের লোক। উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে তিনি বিপ্লবী সমিতির জাল ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে ধরার জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করলে তিনি নাকি সহকর্মীদের কাছে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আমাকে ধরিয়ে দিয়ে সেই টাকাটা তোমরা বিপ্লবের কাজে লাগাও না!

পুলিস কোনোদিন ছুঁতে পারেনি রাসবিহারীকে।

বিচারে অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ এবং বসন্তকুমার বিশ্বাস—এই চারজনেরই ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেল। বসন্তকুমার বিশ্বাসের বয়েস কম বলে প্রথমে তাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল--পরে বিচারকরা তাঁদের ভুল শুধরে নেন। বসন্তকুমার বয়সে ছেলেমানুষ, চেহারাও খুব সুন্দর—সেইজন্য শাড়ি পরালে তাকে ঠিক মেয়েদের মতন দেখাতো। শাড়ি পরে মেয়ে সেজে সে-ই হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলেছিল।

ফাঁসীর আগে অবোধবিহারীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমার কোনো অন্তিম ইচ্ছে আছে?

অবোধবিহারী ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আছে। ইংরেজ শাসন নিপাত যাক।

এই অংশ শেষ করার আগে আর একটি মর্মান্তিক ঘটনা না জানিয়ে পারছি না। এই চারজনের মধ্যে বালমুকুন্দ বিয়ে করেছিল মাত্র এক বছর আগে। তার স্ত্রীর নাম রামরাখী, সরল যুবতী। সে কারাগারে এসে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখানে কি খাও?

বালমুকুন্দ বললো, শুধু দু'খানা রুটি।

সেদিন থেকে রামরাখীও শুধু দু'খানা রুটি খেতে শুরু করে।

কয়েকদিন বাদে সে আবার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কিসে শোও ?

বালমুকুন্দ বললো, একটা কম্বল মাটিতে পাতি, আর একটা কম্বল গায়ে দিই।

সেদিন থেকে রামরাখীও বাড়িতে বিছানা ছেড়ে মাটিতে একটি কম্বল পেতে আর একখানি কম্বল গায় দিয়ে শুতে লাগলো।

তারপর বালমুকুন্দর ফাঁসী হয়ে গেল। এখন তো আর রামরাখীর স্বামী কিছুই খায় না—সুতরাং সেও খাওয়া ছেড়ে দিল একেবারে। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী কেউ তাকে কিছু বোঝাতে পারলো না। বালমুকুন্দর ফাঁসীর অল্প কয়েকদিন পরেই সতী রামরাখীও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।

৫

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় বিপ্লবীদের গতি প্রকৃতি অন্যদিকে মোড় নেয়। এতদিন গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং চোরাগোপ্তা আক্রমণই ছিল বিপ্লবীদের পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ। এবার প্রকাশ্যে এসে মুখোমুখি সশস্ত্র আক্রমণের সময় এসেছে। এবার শুরু হবে বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরী হয় বিদেশে। বৃটেন, জার্মানি, আমেরিকা, ক্যানাডায় প্রবাসী ভারতীয়রা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একটা কিছু করার চিন্তা করছিলেন। বিভিন্ন দেশে স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় সমিতি। রাজদ্রোহমূলক পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সময় জার্মান সরকারের সঙ্গে তাদের একটা যোগাযোগ ঘটে গেল।

যুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই জার্মান সরকার ভারতীয়দের উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিলেন। নিজেদের স্বার্থে, ইংরেজকে দুর্বল করে দেবার জন্য জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন। ভারতীয় বিপ্লবীরা এই প্রস্তাবে রাজী হলেন—তবে কোনোরকম শর্ত না মেনে। এই রকম ঠিক হলো যে ভারতের ব্যাপারে কোনো রকম জার্মান হস্তক্ষেপ থাকবে না। অস্ত্র ও টাকা পয়সা নেওয়া হবে ঋণ হিসেবে এবং পরে স্বাধীন ভারতের সরকার সেই সব ঋণ শোধ করে দেবে।

সর্বাত্মক সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে বিপ্লবীরা ছড়িয়ে পড়লো তুরস্ক, মিশর, জাপান, বার্মা, ব্যাটাভিয়া, সুমাত্রা, চীনে। বিদেশে

বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়াস চলছিল। ভারতের সেনা-ব্যারাকেও গোপন ইস্তাহার ছড়িয়ে তাদের দলে আনবার কাজ শুরু হয়েছিল। প্রবাসী বিপ্লবীরা দেশের ভেতরকার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন।

আমেরিকায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ স্থাপিত হয়েছিল আগেই। ইওরোপ থেকে লালা হরদয়াল এসে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। লালা হরদয়াল এবং বিষ্ণু গণেশ পিংলের উদ্যোগে স্থাপিত হলো গদর পার্টি। গদর কথাটার মানে বিদ্রোহ। এই পার্টির মুখপত্র প্রকাশিত হতে লাগলো গুরুমুখী, হিন্দী, উর্দু, গুজরাতী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায়। এই পত্রিকার একটি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় এই রকম বিজ্ঞাপন ছিল :

আবশ্যক

ভারতে ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য কুশলী বীর যোদ্ধা

বেতন

মৃত্যু

বকশিশ

অমরত্ব

পেনশন

স্বাধীনতা

কার্যস্থল

ভারতবর্ষ

এই বিপ্লবের পরিকল্পনায় কোনো ত্রুটি ছিল না, আয়োজন হয়েছিল বিপুল কিন্তু সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত শুরু হতে পারেনি। ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে আমেরিকায় লালা হরদয়াল গ্রেপ্তার হলেন। জামিনে খালাস পেয়েই পালিয়ে গেলেন ইওরোপে। জার্মান

সরকারের প্রতিশ্রুত অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা পয়সা শেষ পর্যন্ত ভারতে এসে পৌঁছোয় নি। একদিকে করাচী অন্যদিকে বাংলাদেশের সুন্দরবনে কিংবা উড়িষ্যার উপকূলে অস্ত্র-গোলাবারুদ ভর্তি জাহাজ আসার কথা ছিল। ভারতীয় বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে নরেন ভট্টাচার্য ওরফে মিঃ মারটিন ওরফে মানবেন্দ্র রায় সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে দেশের বাইরে চলে গিয়ে সেই জাহাজকে পথ দেখিয়ে আনতে গিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো জাহাজ এলো না। ম্যাভারিক, অ্যানি লারসেন, হেনরি এস প্রভৃতি জাহাজ রসদ গোলা বারুদ ভরে সত্যিই যাত্রা করেছিল—কিন্তু সব কটিই বৃটিশ বা মার্কিন সরকারের হাতে মাঝপথে ধরা পড়ে।

ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনী তখন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। ভারতের ভিতর থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা তারাই বানচাল করে দেয়। পিংলে গোপনে এসে পাঞ্জাবের ফৌজি ব্যারাকে ব্যারাকে ঘুরে কিছু সংখ্যক সিপাহীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহানায়ক রাসবিহারী বসু উত্তর ভারতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে আক্রমণের সমস্ত কৌশল ঠিক করে ফেলেছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয়েছে, জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিনিধিরা, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করার জন্য টেলিগ্রাফের তার কাটারও ব্যবস্থা হয়ে আছে। এমন কি, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে উড়িয়ে দেবার জন্য জাতীয় পতাকাও তৈরী হয়েছে। অভ্যুত্থানের তারিখ ঠিক হলো ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু হঠাৎ জানা গেল পুলিসের কাছে সে খবর পৌঁছে গেছে মাত্র একজন বিশ্বাসঘাতকের জন্য। তখন তাড়াহুড়ো করে সে তারিখ বদলে ঠিক হলো ১৯শে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত বিপ্লবীদের সবকটি কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া গেল না অথচ পুলিসের কাছে পৌঁছে গেল ঠিকই। এতবড় একটা বিরাট পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল, ফল হলো না কিছুই। স্বাধীনতার দীর্ঘকালের ইতিহাসে আমরা

যেমন অসংখ্য হীরের টুকরো বিপ্লবীকে দেখেছি, তেমনি বিশ্বাসঘাতকও কম দেখিনি। এ দেশ সত্যিই বড় বৈপরীত্যের দেশ।

এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রয়াসেই দেশের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বিপ্লবীকে এক সঙ্গে ফাঁসীকাঠে প্রাণ দিতে হয়। রাসবিহারী বসু এবারেও পুলিসের চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশের মধ্যে থাকা তাঁর পক্ষে আর কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না বলে তিনি পি. এন. ঠাকুর এই ছদ্মনাম নিয়ে জাপান চলে যান। সেখানে থেকেও আজীবন ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে গেছেন। বৃদ্ধ বয়েসে তাঁরই হাতে গড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বের ভার তিনি তুলে দিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে।

মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী পিংলে বিদেশে গিয়েছিলেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে। বিপ্লবী দলের নির্দেশে তিনি কাজ করতে এসেছিলেন পাঞ্জাবে। মীরাটে একটি বোমার বাক্স সমেত ধরা পড়ার পর তাঁকেও ফাঁসীর দড়ি গলায় নিতে হয়। পিংলের ফাঁসী হয়েছিল সকলের শেষে। ফাঁসীর কয়েকদিন আগে জেলার এসে তাঁকে বললো, দেখো, দয়া করে তোমাকে আমরা এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছি।

পিংলে উত্তর দিলেন, তাতে আমার কোনোই উপকার করোনি তোমরা—বরং ক্ষতিই করেছো। আমার যে-সব বন্ধুরা আগেই স্বর্গে গেছে, তারা বোধহয় আমাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবছে। আমি যদি আগে যেতাম, আমার বন্ধুদের জন্য জায়গা ঠিকঠাক করে রাখতে পারতাম।

আর একজন তেজস্বী বিপ্লবী কর্তার সিং। তিনি রাসবিহারীর নির্দেশে যাচ্ছিলেন কাবুলে। সেখানে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন করে ফেলেছিলেন আগেই। ঠিক ছিল ভারতে অভ্যুত্থান শুরু হলে তিনি কাবুল থেকে দেশে ফিরবেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার আগেই কর্তার সিং বন্দী হলেন। কর্তার

সিংকে তাঁর আত্মীয় স্বজনরা ফাঁসীর হুকুমের পরেও বলেছিল আপীল করতে।

কর্তার সিং নিরীহ ভাবে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আমার অমুক কাকা কিসে মারা গেছেন?

আত্মীয়রা বললো, অসুখে?

কর্তার সিং আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমার অমুক গাঁয়ের জ্যাঠামশাই কিসে মারা গেছেন?

আত্মীয়রা আবার বললো, অসুখে।

কর্তার সিং তখন বললেন, ওদের বেলায় তোমরা আদালতে আপীল করতে পারোনি? শুধু আমার বেলায় এসেছো কেন? আমার যদি অনেকগুলো জীবন থাকতো, তাহলে প্রত্যেকটা জীবনই আমি স্বাধীনতার জন্য দিতাম।

এত বড় আয়োজন সত্ত্বেও বিদেশ থেকে অস্ত্র এলো না। ইংরেজের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হলো না। ইংরেজের সঙ্গে প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয় উড়িষ্যায়। তার আগে বিপ্লবীদের অস্ত্র সংগ্রহের চমকপ্রদ একটি কাহিনী বলছি।

কলকাতায় আর. বি. রডা অ্যাণ্ড কোম্পানি তখন অস্ত্রশস্ত্রের বড় ব্যবসায়ী। সেই কোম্পানীতে বিপ্লবীদের একটি ছেলে, হাবু মিত্র কাজ করে। সে একদিন খবর আনলো যে ঐ কোম্পানি বিলেত থেকে পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল এবং পঞ্চাশ হাজার কার্তুজ আনিয়েছে তিব্বতের দালাই লামার জন্য। জাহাজ থেকে দু'একদিনের মধ্যেই সেই মাল খালাস করা হবে। বিপ্লবীরা সেই অস্ত্র লুট করার একটা অভিনব পরিকল্পনা নিয়ে ফেললো।

নির্দিষ্ট দিনে বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র পাল একজন গরুর গাড়ির গাড়োয়ান সেজে গরুর গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন খিদিরপুরে। অন্যান্য

গরুর গাড়িতে রডা কোম্পানির জন্য মালপত্র তোলা হচ্ছে, হাবু মিত্র কৌশলে পিস্তল, কার্তুজের বাক্স, স্প্রিং সব তুলে দিল নকল গাড়োয়ানের গাড়িতে। অন্য গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সেই গাড়িটাও চললো, পাশেপাশে দুজন ছদ্মবেশী সশস্ত্র বিপ্লবী সেই গাড়ি পাহারা দিচ্ছে। এক সুযোগে সেই গাড়িখানা একটা গলির মধ্যে ঢুকে উধাও হয়ে গেল। সরাসরি বিপ্লবীদের আস্তানায়।

এই অস্ত্র লুণ্ঠনের সংবাদে ইংরেজ মহলে তুমুল সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ভয় পেয়েছিল সরকার। এই মাউজার পিস্তলগুলি ভারতের নানা প্রান্তে অনেক অ্যাকশানে কাজে লেগেছে।

এই অস্ত্র লুণ্ঠনের ব্যাপারে অন্যতম মস্তিষ্ক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তখন বাংলাদেশে যতীন্দ্রনাথ—যাঁকে দেশবাসী নাম দিয়েছে বাঘা যতীন—ছিলেন বিপ্লবী কর্মযজ্ঞের অন্যতম প্রধান নেতা। তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে একটার পর একটা দুঃসাহসী কাজ করে যাচ্ছিলেন পুলিসের নাকের ডগার ওপর দিয়ে। একবার পুলিসের হাতে ধরা পড়েও তিনি প্রমাণের অভাবে ছাড়া পান। বেরিয়ে এসেই আবার কাজ শুরু করেন পূর্ণ উদ্যমে। বাঘা যতীন গায়ের জোরে যেমন ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী তেমনি তাঁর মনের জোরও ছিল সাঙ্ঘাতিক।

বাঘা যতীনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের। গদর আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের নেতৃত্বের ভারও ছিল তাঁর ওপরে। কাশীতে গিয়ে রাসবিহারী এবং পিংলের সঙ্গে দেখা করে তিনি পূর্ব ভারতে অভ্যুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। জার্মান জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র উড়িষ্যার উপকূলে নামবে এই আশায় যতীন্দ্রনাথ তাঁর দলবল নিয়ে চলে এলেন উড়িষ্যায় এবং কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য বালাশোরে একটা সাইকেলের দোকান খুললেন।

সে দোকানও পুলিসের নজরে পড়লো। কলকাতা থেকে পুলিস এসে সে দোকান সার্চ করবার আগেই বিপ্লবীরা সেখান থেকে সরে পড়েছে। কিন্তু সেখানেই একটা কাগজের টুকরোয় সূত্র পাওয়া গেল, নীলগিরির একটি গ্রামে বিপ্লবীদের আর একটা আস্তানা আছে। বিপ্লবী-খোঁজে চতুর্দিক থেকে শুরু হলো পুলিসী অভিযান।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর দল নিয়ে জঙ্গল ও নদীপথে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় লুকিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোনো সাহায্য পেলেন না স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে। বিপ্লবীরা তখনও শুধু গোপন সংগঠনে বিশ্বাসী, জনসংযোগের কোনো চেষ্টাই করেনি কখনো। পুলিস ইতিমধ্যেই রটিয়ে দিয়েছে যে কয়েকজন ভয়ংকর চরিত্রের বাঙালী ডাকাত এখানে ঘোরাফেরা করছে। স্থানীয় লোকেরা সামান্য সূত্র পেলেই পুলিসকে জানায়, খেয়াঘাটের মাঝিরা ওদের পার করতে চায় না।

শেষ পর্যন্ত বালেশ্বরের বুড়ি বালামের তীরে শুরু হলো প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পালকে সঙ্গে নিয়ে বাঘা যতীন আশ্রয় নিয়েছেন একটা উই ঢিবির আড়ালে। দু'দিক থেকে ঘিরে আসছে পুলিস বাহিনী—তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কুখ্যাত টেগার্ট। নদীর পার থেকে পুলিস বাহিনী দূর পাল্লার রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ে সংকেত জানালো আত্মসমর্পণ করার। বাঘা যতীন তাঁর বন্ধুদের দিকে তাকালেন। বন্ধুরা সবাই আগুনে পোড়ানো ইস্পাত। ধরা পড়লে ফাঁসী কিংবা দ্বীপান্তর তো হবেই। তার আগে রাজশক্তিকে একবার দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে ভারতীয় যুবকরা মুখোমুখি লড়াইয়ের সাহস রাখে। হাতিয়ারের জোর না থাকলেও তাদের মনের জোর আছে। চারপাশে ডজন ডজন রাইফেলধারী পুলিস, মাঝখানে শুধু পিস্তলধারী পাঁচজন যুবক। গর্জে উঠলো বিপ্লবীদের পিস্তল।

যতক্ষণ কাতুর্জ ছিল তারা লড়েছে। তারপর তারা উড়িয়ে দিল সাদা পতাকা। পুলিস সতর্ক ভাবে কাছে গিয়ে দেখলো, চিত্তপ্রিয় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, যতীন্দ্রনাথ সাংঘাতিকভাবে আহত— কোনো রকম স্বীকারোক্তি না দিয়ে পরদিন সকালে তিনি মারা যান। বাকি তিনজনের মধ্যে দুজনের ফাঁসী হয়, অন্যজনের দ্বীপান্তর। যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই পাঁচজন বীর বিপ্লবী ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় রেখে গেলেন।

৬

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর বিপ্লবী কাজকর্মে কিছুটা ভাটা পড়ে। বিপ্লবীরা অস্ত্র সংগ্রহের উপায় এবং নতুন রণকৌশল খুঁজছিলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে পরিপূর্ণ ভাবে অবতীর্ণ হয়েছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এই বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার বিলেতি পোশাক ছেড়ে কটিবাস মাত্র ধারণ করে নেমে এসেছেন জনতার মধ্যে। তিনিই প্রথম শোনালেন, দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষকে আন্দোলনের সঙ্গী না করতে পারলে স্বরাজ আসতে পারে না। হরিজন এবং মহাজনকে এক সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। ব্রিটিশ রণশক্তির তুলনায় ভারতীয়দের অস্ত্রশক্তি তুচ্ছাতিতুচ্ছ। সুতরাং অহিংসা এবং সত্যাগ্রহই হবে ভারতীয়দের প্রধান অস্ত্র। এদিকে কংগ্রেসও সাহেবী কায়দার ক্লাবের বদলে আস্তে আস্তে একটি জাতীয় দলের রূপ নিয়েছে। গান্ধীজী এই কংগ্রেসের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা এনে দিলেন। দেশের চিন্তাশীল মানুষ এবং কর্মীরা একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলো, এই পথেই স্বাধীনতার নতুন সূর্য দেখা যাবে কিনা।

গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে প্রথম প্রচণ্ড আঘাত পড়লো জালিয়ানওয়ালাবাগে। দেশের মানুষ দেখলো, অহিংসার বাণী ইংরেজের কাছে কৌতুক মাত্র। ইংরেজ এ দেশের মানুষের প্রাণের দাম কানাকড়িও দেয় না।

জালিয়ানওয়ালাবাগ। অমৃতসর শহরের মাঝখানে স্বর্ণমন্দির—তার খানিকটা দূরেই সাঠেওয়ালা বাজারের গা ঘেঁষে একটা সরু

গলি দিয়ে গেলে চোখে পড়বে খানিকটা ঘেরা জায়গা। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল এখানে ঘটেছিল সেই নারকীয় ঘটনা—যার তুলনা সারা বিশ্বে কোথাও পাওয়া যাবে না।

১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত সরকার অ্যানার্কিক্যাল অ্যাণ্ড ক্রাইমস অ্যাকট পাস করার চেষ্টা করে—যার ফলে যে-কোনো ব্যক্তিকে যে-কোনো সময়ে গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়া যাবে। অর্থাৎ সরকারের হাতে আসবে আর একটি নিষ্পেষণের যন্ত্র। এই আইন রাউলাট বিল নামে পরিচিত। গান্ধীজী তীব্র ভাষায় এই বিলের প্রতিবাদ করলেন। তাঁর প্রতিবাদ ইংরেজ গ্রাহ্য করলো না। গান্ধীজী অনশন করলেন—পুলিস দিল্লীর জনতার ওপর গুলি চালালো। গান্ধীজী দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিলেন, বোম্বাই লাহোর, দিল্লী, কলকাতায় হাঙ্গামা বেঁধে গেল, আবার পুলিসের গুলি। গান্ধীজী বোম্বাই থেকে দিল্লী যাত্রা করলেন, মাঝপথে ট্রেন থামিয়ে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে দিল্লী এবং পাঞ্জাব প্রদেশে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ। গান্ধীজী মানলেন না সে নির্দেশ, তিনি গ্রেফতার হলেন। সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো।

অমৃতসর শহরে তখন সর্ববাদীসম্মত নেতা দুজন। ব্যারিস্টার সইফুদ্দিন কিচলু এবং ডাক্তার সত্যপাল। হিন্দু-মুসলমানের সেখানে অভূতপূর্ব ঐক্য দেখা দিয়েছে—যা ইংরেজের চোখে মোটেই ভালো লাগে না। এই দুজন তখন শান্তিপূর্ণ জনতার মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার আলোচনার জন্য এই দুই নেতাকে ডেকে আনলেন নিজের বাংলোতে। কোনোরকম আলোচনা হলো না, আসা মাত্রই এঁদের দুজনকে বন্দী করে গোপনে নিয়ে যাওয়া হলো শহরের বাইরে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই খবর পেয়ে জনতা ক্ষেপে উঠলো। তারা দাবি জানালো আমাদের প্রিয় নেতাদের ফেরত দাও।

নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালিয়ে মেরে ফেলা হলো তিরিশ জনকে। শহরে শুরু হলো অগ্নিকাণ্ড। ক্রুদ্ধ জনতার হাতেও এর পর মারা গেল পাঁচজন ইংরেজ।

পাঞ্জাবের গভর্নর তখন ও' ডায়ার। তিনি ডেকে পাঠালেন জেনারেল ডায়ারকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসতে। ও' ডায়ার এবং ডায়ার এই দুই মধু-কৈটভ মিলে আরম্ভ করলো বীভৎস তাণ্ডব।

জেনারেল ডায়ার এসেই ফতোয়া দিয়ে দিল, অমৃতসরের কোনো লোক শহরের বাইরে বেরুতে পারবে না, আর রাত আটটা থেকে শহরে কারফিউ। ঠিক আছে রাত আটটা থেকে কারফিউ, বিকেল সাড়ে চারটের সময় সভা করা তো বে-আইনি নয়। কিন্তু সভা সমিতিও ডায়ারের চোখে বে-আদপি এবং তিনি গ্রেফতারে বিশ্বাস করেন না।

জালিয়ানওয়ালাবাগে সভা বসেছে, প্রায় পাঁচ সাত হাজার মানুষ, এসেছে স্ত্রীলোকেরাও, অনেকে এসেছে তাদের শিশু পুত্রকেও সঙ্গে নিয়ে। সভা পরিচালনা করছেন শ্রীহংসরাজ। টেবিলে ডাঃ কিচলুর ছবি—তিনিই অনুপস্থিত সভাপতি। শ্রীহংসরাজ বেশীক্ষণ বক্তৃতা করতে পারেননি—এর মধ্যেই .....

জালিয়ানওয়ালাবাগ তিন দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। একটি মাত্র সরু গলি দিয়ে যাওয়া আসার পথ। সেই গলির মুখ বন্ধ করে জেনারেল ডায়ার ঢুকলো সৈন্য বাহিনী নিয়ে। কোনো সতর্কবাণী উচ্চারণ করলো না, কোনো প্রশ্ন করলো না, হাত তুলে বললো, চালাও গুলি! নারী, শিশু, বৃদ্ধ কিছু দেখার দরকার নেই, বৃষ্টির মতন গুলি চালাও!

বিহ্বল বিমূঢ় জনতা ছুটোছুটি শুরু করলো, কিন্তু পালাবে কোথায়? এ ওর ঘাড়ে, এ ওর পিঠের ওপর পড়ে মরতে লাগলো। আজও কি কানে বেজে ওঠে না তাদের সেই মর্মভেদী চিৎকার? যারা

মরলো, তারা তো মরেই গেল, যারা আহত, তাদেরও চিকিৎসার কোনো উপায় রইলো না। আত্মীয় স্বজনদেরও উপায় নেই যে সেই শ্মশানক্ষেত্র খুঁজে দেখবে—কে বেঁচে আছে বা কে মরেছে। শহরে তখন কারফিউ। রাস্তায় রাস্তায় একপাল হায়নার মতন ডায়ারের সৈন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে—যে-কোনো লোক দেখলেই গুলি চালাবে। কত আহত মানুষ সেদিন শুধু জল, জল বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মারা গেছে।

কত লোক মরেছিল সেই বিকেলে? তিনশো? চারশো? সাড়ে চারশো? এক একটা সরকারী হিসেবে এক এক রকম সংখ্যা। ভারতীয় প্রাণ তো—এক শো দেড়শো কম বেশী হলেও কিছু যায় আসে না।

শুধু সেইদিনই শেষ নয়। পাঞ্জাবের বিক্ষোভ দমন করার জন্য এর পরের কয়েকটি দিনও উন্মত্ত তাণ্ডব চলেছে। লাহোরে এরোপ্লেন থেকে বোমা ও মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষকে মারা হয়েছে চাবুক। নিরীহ পথচারীকে বাধ্য করা হয়েছে রাস্তা দিয়ে বুকে হেঁটে যেতে। শহরের মাঝখানে বন্দীদের ভরে রাখা হয়েছে খাঁচায়—আর হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পরিণাম বোঝাবার জন্য একসঙ্গে একজন হিন্দু আর একজন মুসলমানকে শিকলে বেঁধে দেখানো হয়েছে লোকদের।

সেনাপতি ডায়ার তাঁর এই বীরত্বের জন্য পুরস্কারও কম পাননি। হাণ্টার কমিটির রিপোর্টের ফলে তাঁকে সামরিক বাহিনী ছাড়তে হলেও এদেশের প্রতিটি ইংরেজ সংবাদপত্র তাঁকে ধন্য ধন্য করেছে। বিলেতে ফিরে যাবার পর তাঁর দেশবাসী চাঁদা তুলে ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ড ডায়ারকে উপহার দিয়েছিল শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে। কতগুলো নেটিভকে মেরে ডায়ার ইংরেজ রাজত্বকে বাঁচিয়েছে।

ভারতের সমস্ত বড় বড় নেতা জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরতার

কাহিনী সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেন। মতিলাল নেহরু, গান্ধীজী, মদন মোহন মালব্য সরকারী তদন্তকে চ্যালেঞ্জ জানান। এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের দেওয়া নাইট-হুডের সম্মান দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে জানালেন :

The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my country-men, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings.

এবং, সমগ্র ইংরেজ জাতের পক্ষ থেকে সেই সময় একমাত্র ক্ষমা-ভিক্ষা করেছিলেন দীনবন্ধু সি. এফ. এনড্রুজ। তিনি পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে ঘুরে শোকার্ত মানুষের পায়ে হাত দিয়ে বলেছেন, আমার জাতির পাপের জন্য আমাকে ক্ষমা করো।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সামান্য আগেই গান্ধীজী এসে যোগ দিয়েছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে। তাঁর সত্যাগ্রহের প্রথম ডাক বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও উৎপীড়নে শেষ হয়। তবু ভারতীয় নেতৃবর্গ গান্ধীজীকেই সর্বপ্রধান নেতা হিসেবে মেনে নিলেন। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনে গান্ধীজীর কৃতিত্ব সকলকেই অভিভূত করেছে এক সময়। তা ছাড়া, তখন এমন একজন নেতার প্রয়োজন ছিল, যিনি বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক কর্মীদের এবং দেশের হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণকে এক পথে চালাতে পারবেন।

আধুনিক ভারতের প্রথম রাজনৈতিক বিপ্লবের মন্ত্রগুরু তিলক মহারাজের মৃত্যু হলো ১৯২০ সালে। মৃত্যুর আগে তিনিও গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়ে গেলেন। বাংলায় চিত্তরঞ্জন

দাশ বেপরোয়া বিপ্লবীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে টেনে আনলেন কংগ্রেসে। পুলিসের অত্যাচারে বিপর্যস্ত দলগুলিও তখন কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে মেনে নিল। সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী বললেন, তোমারা যদি অহিংসাকে আদর্শ বলে মেনে নিতে নাও পারো, একে একটা উপায় হিসেবে গ্রহণ করো। আমি এক বছরের মধ্যে তোমাদের স্বরাজ এনে দেব।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় শেষ হয়ে গেল। স্বরাজ এলো না। স্বরাজ দূর অস্ত্। বিপ্লববাদীরা আবেদন নিবেদনের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবার ছড়িয়ে পড়লো নানা দিকে।

৭

সত্যাগ্রহের পথ পরিত্যাগ করে দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বাললেন আল্লুরি সীতারাম রাজু। গঞ্জাম, বিশাখাপত্তম এবং গোদাবরী জেলার পাহাড়ী ও অরণ্য এলাকায় আদিবাসীদের নিয়ে দল গড়লেন তিনি। পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্য তিনি সাধু সেজে থাকতেন আর গোপনে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকাপয়সা সংগ্রহের কাজ চলছিল। দিনের বেলা সীতারাম রাজু তাঁর আশ্রমে ধর্ম উপদেশ দিতেন আর রাত্রিবেলা সদলবলে পুলিস চৌকি লুঠ করে আসতেন। সাধারণ দীন দুঃখী মানুষদের মধ্যে সেবার কাজও করতেন তিনি।

ক্রমশ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে রাজুর দলের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাজু আত্মগোপন করলেন দুর্গম জঙ্গলে, হঠাৎ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তেন ইংরেজ বাহিনীর ওপর। প্রায় আড়াইশো পুলিস চৌকি তিনি লুণ্ঠন করেছিলেন।

এই সময় পৃথ্বীসিং আজাদ নামে একজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে আন্দামান থেকে এনে রাজমহেন্দ্রী জেলে রাখা হয়েছিল। সীতারাম রাজু ঘোষণা করে দিলেন যে একটা নির্দিষ্ট দিনে তিনি রাজমহেন্দ্রী জেল ভেঙে পৃথ্বীসিং আজাদকে মুক্ত করে আনবেন। সরকার রাজুকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতে জেলের আশেপাশে বহু পুলিস এনে গোপন পাহারা রাখলেন। কিন্তু সরকারকে টেক্কা দিয়ে গেলেন রাজু। সে রাত্তিরে রাজমহেন্দ্রী জেলের ধারে কাছেও তিনি এলেন না—বরং পুলিস সরিয়ে আনার জন্য কাছাকাছি যে-কয়েকটা থানা প্রায় ফাঁকা পড়েছিল—এক সঙ্গে সেরকম আট দশটি থানা লুঠ করে নিয়ে গেলেন।

কয়েকবার সংঘর্ষে জয়ী হয়ে রাজুর সাহস খুবই বেড়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ তাঁকে পরিত্রাতার মতন ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তিনিও ইংরেজদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভয় ভেঙে দিচ্ছিলেন। তখন আসাম রাইফেল্‌সের পুরো একটি বাহিনী নিয়োগ করা হলো রাজুর দলের বিরুদ্ধে। রাজুকে ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু একজনও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। ১৯২৪-এর ৬ই মে রাজুর দলের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধ লাগে। বীরের মতন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে এগারোজন সঙ্গীর সঙ্গে রাজু সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করেন। রাজুর বাকি দলবল আরও কিছুদিন যুদ্ধ চালিয়ে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল।

উত্তর প্রদেশে বিপ্লবীরা হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি গঠন করেছেন। বাংলার ছেলেরাও সেখানে গিয়ে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। শচীন সান্যাল দলের কর্মপদ্ধতি ঠিক করছেন।

উত্তর প্রদেশের বিপ্লবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগলেন, বাংলায় বোমা বানানো হতে লাগলো তাদের জন্য এবং অর্থ সংগ্রহের কাজও চলতে লাগলো সরকারী তহবিল লুঠ করে। সবচেয়ে দুর্ধর্ষ সাহসের পরিচয় দেন তাঁরা কাকোরি ট্রেন লুণ্ঠনে।

১৯২৫-এর ৯ই আগস্ট সন্ধেবেলা একটা ট্রেন আসছে লক্ষ্ণৌ-এর দিকে। সেই ট্রেনের ব্রেকভ্যানে লুকিয়ে আছে চারটি ছেলে। কাকোরি স্টেশনের থেকে কিছু দূরে এসেছে ট্রেন—সেই ছেলে চারটি লাফিয়ে এসে গার্ডের কামরায় ঢুকে গার্ডকে বললো ট্রেন থামাতে। গার্ড রাজী না হওয়ায় দুজন তার বুকের কাছে উঁচিয়ে ধরলো রিভলবার, আর দুজন চেন টেনে দিল। ট্রেন থেমে যেতেই আরও ষোলজন যুবক এসে গার্ডের কামরা থেকে টপাটপ নামিয়ে নিতে লাগলো টাকার বাক্স। একজন ইওরোপিয়ান এবং একজন গুর্খা

যাত্রী বন্দুক নিয়ে তাদের বাধা দিতে এলে বিপ্লবীরা গুলি চালিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল তাদের।

এই সময় উল্টো দিক থেকে একটা ট্রেন এসে পড়ায় বিপ্লবীরা তাড়াতাড়ি সরে পড়লো মালপত্র নিয়ে। বিরাট পুলিস বাহিনী এসে এরপর তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাদের কোনো পাত্তা পেল না।

এই বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব করেছিলেন পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল। সহযোগী আসফাকউল্লা। প্রায় দেড়মাস পরে একজন বিশ্বাসঘাতকের জন্য একে একে ধরা পড়ে গেলেন অনেকে। এঁদের সন্ধানে পুলিস সারা উত্তর প্রদেশ, কলকাতা এমনকি সিঙ্গাপুরেও তল্লাস করতে ছাড়েনি। বিপ্লবীরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন, আদালতের কাঠগড়ায় আবার সবার সঙ্গে দেখা। যেন পুরনো বন্ধুরা একটা উৎসবে মিলিত হয়েছেন, এই ভাবে সবাই সবাইকে উল্লাসে অভ্যর্থনা করলেন।

পিনহানে বালে অগর বেড়িয়া পিনহায়েংগে
খুশিসে কৈদকো গোশে কো হম বসায়েংগে

[পুলিস যদি আমাদের হাতকড়ি দিয়ে বন্দী করে রাখে—তবে জেলখানাকেই আমরা নিজেদের ঘরবাড়ি বানিয়ে নেবো।]

ঔর সংতরী দরে জিন্দাকে সো ভি জায়েংগে
তো রাগ গা গা কর হম উনহে নীয়দ সে জাগায়েংগে।

[আর আমাদের কুঠরীর দরজায় পাহারাদার শাস্ত্রী যদি ঘুমিয়ে পড়ে, তা হলে আমরা স্বদেশী গান গেয়ে ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবো।]

কলকাতা থেকে ধরে আনা হয়েছে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীকে—এর আগেই বোমার কেসে তার দশ বছর কারাদণ্ড হয়ে গেছে। অসম্ভব তেজস্বী যুবক। ব্রাহ্মণ হয়েও সে তার পৈতে ছিঁড়ে ফেলেছে, গরু ও শুয়োরের মাংস প্রকাশ্যে খেয়ে সে জানিয়েছে, সে হিন্দু বা মুসলমান নয়, সে ভারতীয়।

কাবুল যাবার পথে গ্রেপ্তার হয় আসফাকউল্লা। এই সুদর্শন উন্নত চেহারার যুবকের মনের জোর ছিল অসাধারণ। বিভেদপন্থী ব্রিটিশ সরকার তাকে অনেক কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। তার আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে বলাবার চেষ্টা করেছিল, সে মুসলমান হয়ে কেন হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে? সে ওদের সংস্রব ত্যাগ করলেই বেঁচে যাবে। আসফাকউল্লা বলেছিল, ক্ষুদিরাম কানাই যদি দেশের জন্য ফাঁসীতে প্রাণ দিতে পারে, তবে মুসলমান হয়ে জন্মেছে বলেই সে কেন পারবে না? মুসলমান কি দেশকে ভালোবাসে না? রামপ্রসাদ বিসমিল তার নেতা। একজন ব্রিটিশ আর একজন হিন্দুর মধ্যে যদি শুধুমাত্র একজনকে বেছে নিতে বলা হয় তাকে, তা হলে সে একজন হিন্দুকেই বেছে নেবে। কারণ, সে শুধু হিন্দু নয়, ভারতীয়—তার নিজের দেশের মানুষ!

পলাতক থাকার সময় একজন খুব রূপসী মেয়ে আসফাকউল্লাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আসফাক তাকে বলেছিল, আমি খুবই দুঃখিত—আমি এখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছি, আমার বিয়ে করার সময় নেই।

ঠাকুর রোশন সিং বিরাট বলশালী পুরুষ। কুস্তিতে তাঁকে কেউ হারাতে পারে না। জেলখানায় তিনি সবাইকে কুস্তি শেখান।

আর এদের নেতা রামপ্রসাদ বিসমিল—একদিকে যেমন দারুণ তেজস্বী অন্যদিকে তেমনি শান্ত। ভয় কাকে বলে সে জানে না। আদালতে হাতকড়ি বাজিয়ে বাজিয়ে রামপ্রসাদ বিসমিল গাইত নিজের লেখা গান:

সর্ ফরোশী কি তমন্না অব হমারে
দিল্ মেঁ হ্যায়
দেখ না হ্যায় জোর কিতনা বাজু এ
কাতিল মেঁ হ্যায়।

[এখন আমার মনে জেগে রয়েছে মৃত্যুকে স্পর্শ করার চিন্তা। দেখতে চাই, ঘাতকের বাহুতে কত জোর আছে।]

অব্‌না অগ্‌লে ওয়ল্‌লে হ্যায় আউর
না আরমানো কী ভীড়
সির্‌ফ্‌ মর মিট্‌নেকি হসরৎ আপ্‌
দিলে এ বিসমিলে মেঁ হ্যায়।

[মিটে গেছে সকল বাসনা। থেমে গেছে আগেকার সব কলগুঞ্জন। বিসমিলের হৃদয়ে এখন শুধু মৃত্যুকে বরণ করার আকাঙ্ক্ষা।]

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় বিসমিল, আসফাক, ঠাকুর রোশন আর রাজেন—এই চারজনেরই ফাঁসীর হুকুম হয়ে যায়।

কারাগারে দেখা করতে এসেছেন বিসমিলের মা। মাকে দেখে বিসমিলের চোখে জল এসে গেল। মা তাই দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একি, তুই মরতে ভয় পাচ্ছিস? তাই শুনে হাসলো বিসমিল। মায়ের দুঃখের কথা ভেবেই তার চোখে জল এসেছিল। যেমন ভারত-মাতার দুঃখে সে কাঁদে। নইলে নিজের মৃত্যুকে কেন ভয় পাবে বিসমিল? 'সির্‌ফ মর মিট্‌নেকি হসরৎ আপ্‌ দিলে এ বিসমিলে মেঁ হ্যায়।'

ফাঁসীর কয়েকদিন আগে রাজেন লাহিড়ী জানিয়ে গেলেন, আমার মৃত্যুর জন্য যেন কেউ দুঃখ না করে। বরং সবাই প্রার্থনা করুক, আমি যেন এই দেশেই আবার জন্মাতে পারি।

রামপ্রসাদ বিসমিল সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে ফাঁসীর মঞ্চে উঠেছিলেন গান গাইতে গাইতে। সর্‌ ফরোশী কি তমন্না অব হমারে দিল মেঁ হ্যায়—।

ঠাকুর রোশন সিং ফাঁসীর দড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, রোশন, চেয়ে ছাখ, এর নাম জীবনের সার্থকতা। বন্দেমাতরম্‌।

আসফাকউল্লা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রথম

মুসলমান, যাঁর মৃত্যু হয় ফাঁসীর দড়িতে। ফাঁসীর আগের দিন এক বন্ধু দেখা করতে এলে আসফাকউল্লা তাকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এবার আমার সময় হয়েছে, কাল আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।

কাকোরি ট্রেন লুণ্ঠনে অংশগ্রহণকারীরা সকলে ধরা পড়েনি। তাদের মধ্যে ছিল একটি উনিশ বছরের ছেলে। এই ছেলেটি চোদ্দ বছর বয়েসের সময়ই প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে কখনো জেলখানায় আটকে থাকবে না। তারপর পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সে বেঁচে ছিল। না, ব্রিটিশের কারাগারে গিয়ে সে শৃঙ্খল পরেনি।

উত্তর প্রদেশের গ্রাম থেকে সে তের বছর বয়েসেই চলে আসে বোম্বাই। সেখানে সে নৌকোয় রং করার চাকরি নিয়েছিল। কিন্তু সামান্য জীবন যাপন করার মতন মানুষ সে নয়। বোম্বাই থেকে সে চলে এলো কাশীতে, ভর্তি হলো সংস্কৃত বিদ্যালয়ে। সেখানে তার ওপরের ক্লাসেই তখন পড়তেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ছেলেটি অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে স্কুল ছাড়লো এবং গ্রেপ্তার হলো।

হাকিম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ?

ছেলেটি চিৎকার করে বললো, আজাদ !

—বাবার নাম কি ?

—স্বাধীন !

—ঠিকানা কি ?

—এখন এই আদালত !

হাকিম তাকে পনেরো ঘা বেত মারার হুকুম দিলেন। প্রত্যেক-বার বেত মারার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি ধ্বনি দিতে লাগলো, জয় গান্ধীজী !

এই অসম সাহসী ছেলেটিকে সম্বর্ধনা জানালেন পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য। আদালতে নিজের নাম আজাদ বলেছিল বলে সেদিন থেকেই তার নামে আজাদ যুক্ত হয়ে গেল। বিপ্লবের ইতিহাসে

এঁর নাম চন্দ্রশেখর আজাদ—এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। গান্ধীজীর পথ ছেড়ে আজাদ অবিলম্বেই যোগ দিয়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে—এবং নির্বাচিত হয়েছিলেন হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির সেনাপতি।

কাকোরি ট্রেন লুণ্ঠনের পর আজাদ পাঞ্জাব, দিল্লীতে আরও অনেক অ্যাকশানে অংশ নিয়েছিলেন—কোনোদিন পুলিস তাঁকে ছুঁতে পারেনি। কত ইস্তাহার সাঁটা হয়েছে তাঁর নামে, কত রকম পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে—কিন্তু আজাদ যেন যাদুকরের মতন অদৃশ্য করে রেখেছেন নিজেকে।

আজাদ তাঁর দলের হয়ে যেমন পরিকল্পনা রচনা করতেন, সেই-রকম আবার প্রতিটি ঘটনায় নিজে অস্ত্র নিয়ে উপস্থিত থাকতেন। আজাদের হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, মোটা গোঁফ—ছদ্মবেশ ধারণ করলে তাঁকে নিরীহ নাগরিকের মতন দেখায়। কিন্তু পিস্তল ছোঁড়ায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার কথা সাহেবরাও স্বীকার করে গেছে।

একে একে আজাদের দলের ছেলেরা ধরা পড়ছে, কারুর দ্বীপান্তর, কারুর ফাঁসীর দণ্ড হয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রশেখর আজাদ কখনো ভেঙে পড়েননি—তিনি বন্ধুদের জেল ভেঙে উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন—নতুন করে দল তৈরী করতে চাইছেন।

একবার ভগৎ সিং আজাদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভাইয়া, আপনি যে এ রকম বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়ান, আপনার মরণের ভয় নেই ?

আজাদ হাসতে হাসতে শ্লোক বানিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন :

যব সে শুনা হ্যায়
মরণে কো নাম জিন্দেগী
শিরসে কাফন বান্ধে
কাতিলকে ঢুঁড়তে হ্যায়।

[যেদিন থেকে শুনেছি, মরণেরই আর এক নাম জীবন। সেদিন থেকে মাথায় কাফন বেঁধে আমি যমদূতকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।]

১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি। এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে সকাল সাড়ে ন'টার সময় আজাদ তার এক দলের এক কর্মী সুখদেও রাজের সঙ্গে একটা বেঞ্চে বসে পরামর্শ করছিলেন। বীরভদ্র তেওয়ারি নামে এক বিশ্বাসঘাতক ওঁদের চিনতে পেরে চুপিচুপি গিয়ে কোতোয়ালিতে খবর দেয়। সি. আই. ডি. সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ নাটবাউয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চলে এলেন। আজাদ কথা বলায় মশগুল হয়ে ছিলেন, এসব কিছুই টের পাননি।

পুলিস বাহিনী যখন প্রায় কুড়ি গজের মধ্যে এসে গেছে তখন আজাদ সজাগ হয়েই গুলি চালালেন। আজাদের দু-এক মুহূর্ত মাত্র দেরী হয়েছিল, পুলিসের গুলি আগে এসে বিঁধলো তাঁর উরুতে। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। পরক্ষণেই আবার গুলি চালিয়ে নাটবাউয়ারকে জখম করে আজাদ হামাগুড়ি দিয়ে আশ্রয় নিলেন একটা জামগাছের আড়ালে।

শুকদেও রাজ আর একটা গাছের আড়ালে লুকিয়েছে। সেও যখন বেরিয়ে এসে পুলিসকে আক্রমণ করতে গেল, আজাদ চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন, আমার জন্য তোমায় অপেক্ষা করতে হবে না। তুমি পালাও!

সেনাপতির হুকুম অগ্রাহ্য করতে পারে না শুকদেও রাজ। সে একটু দূরে দাঁড়ানো একটি ছাত্রের কাছ থেকে সাইকেল কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। আজাদের হাত থেকে তখন মুহুর্মুহু গুলি চলছে।

পনেরো মিনিট ধরে এই অসম যুদ্ধ চললো। কয়েকজন পুলিস পেছন দিক থেকে এসে আক্রমণ করলো আজাদকে। ঠাকুর বিশ্বেশ্বর সিং নামে এক পুলিস অফিসার আজাদের পিঠে গুলি চালালো। আজাদ ঘুরে দাঁড়িয়ে এক গুলিতে চোয়াল উড়িয়ে দিলেন সেই

ঠাকুরের। এরই মধ্যে কর্নেলগঞ্জ থানা থেকে রায়সাহেব বিশাল সিং চৌধুরী রাইফেলধারী সিপাহীদের সঙ্গে নিয়ে এসে পড়লেন। এ যুদ্ধ আর বেশীক্ষণ চলতে পারে না। কিন্তু দেশবাসী যার নাম দিয়েছে আজাদ, সে কখনো জীবন্ত ধরা দেবে না। আজাদ পিস্তলের নল নিজের কপালে ঠেকিয়ে শেষ গুলি চালালেন।

আজাদ সম্পর্কে পুলিসের এত ভয় ছিল যে সেই মৃতদেহের ওপরেও তারা আরও গুলি বর্ষণ করতে লাগলো। তারপর কাছে এসে তারা বেয়নেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিল সেই বীর সৈনিকের দেহ।

আজাদের মৃত্যু সংবাদ দাবনলের মতন ছড়িয়ে গেল সারা এলাহাবাদ শহরে। অবিলম্বে পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন আর কমলা নেহরু এক বিশাল জনতার সঙ্গে অকুস্থলে এসে আজাদের মৃতদেহ দাবি করলেন পুলিসের কাছে। পুলিস তা প্রত্যাখ্যান করে আজাদের মৃতদেহ সরিয়ে ফেললো—রসুলাবাদ ঘাটে কড়া পাহারায় অতি দ্রুত পুড়িয়ে ফেললো সেই দেহ। জনতা তবু ধেয়ে এলো সেখানে। আজাদের অস্থি নিয়ে মিছিল বেরুলো—গোটা এলাহাবাদ উত্তাল। বিপ্লবী শচীন সান্যালের স্ত্রী প্রতিমা সান্যাল আজাদের ছাইয়ের তিলক নিজের কপালে পরে নিলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

আলফ্রেড পার্কে যে জামগাছের নীচে আজাদের রক্ত ঝরেছিল—স্থানীয় লোকেরা সে জায়গাটাকে তীর্থস্থান বানিয়ে পূজা দিতে লাগলো। এটুকুও সহ্য হলো না পুলিসের। তিনদিন পর পুলিস কর্তৃপক্ষ সেই জামগাছটাই কেটে ফেললো।

আজাদের লম্বা চওড়া চেহারা দেখে তার দলের কেউ কেউ ইয়ার্কি করে বলতো, তোমার যা দশাশই চেহারা তাতে তোমাকে ফাঁসীতে লটকানোর জন্য একটা খুব মোটা দড়ির দরকার হবে। আজাদ

গোঁফে তা দিয়ে হাসতে হাসতে বলতেন, ফাঁসী তো তোমাদেরই কপালে আছে! আজাদের জন্য নয়।

হম তো দুশমনোকি গোলিয়োঁকা সামনা করেঙ্গে
হাম আজাদ হি হ্যায়, হাম আজাদই রহেঙ্গে।

[আমি তো দুশমনের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করব। আমার নাম আজাদ, আমি স্বাধীন, আমি স্বাধীনই থাকবো।]

হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র ভগৎ সিং। এই অসীম তেজস্বী রূপবান শিখ যুবকের জীবনকাহিনী বর্ণনার জন্য ভাষা খুঁজে পাওয়া শক্ত। এই পৃথিবীতে সে বেঁচেছিল মাত্র তেইশ বছর পাঁচ মাস সাড়ে ছাব্বিশ দিন। এই সংক্ষিপ্ত জীবনে সে উল্কার মতন জ্বলেছে ভারতের আকাশে, নিজে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কিন্তু জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে আগুন। উদ্দাম প্রাণবন্ত ভগৎ সিং একদিকে কবি ও সুরসিক—অপরদিকে চিন্তাবিদ এবং কঠোর আদর্শবাদী এক অপরাভূত শক্তি।

ভগৎ সিং-এর বাবা এবং কাকা এক সময় ব্রিটিশের কোপানলে পড়েছিলেন। এই ছেলেটিও যাতে ঘরছাড়া না হয়, সেই জন্য বাড়ি থেকে অল্প বয়সেই তার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ভগৎ সিং জন্ম থেকেই যেন দেশের জন্য বলি প্রদত্ত। বিপ্লবের কাজে যোগদানের জন্য তিনি বাড়ি ছেড়ে এসে প্রখ্যাত বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির পাঞ্জাব শাখার নেতৃত্বের ভার পেয়েছিলেন ভগৎ সিং এবং তাঁর বন্ধু শুকদেব। তার আগে, উনিশ শো আঠাশ সালে দিল্লীর পুরোনো কেল্লায় এক গুপ্ত বৈঠকে বিপ্লবীরা বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। নানান প্রদেশের বিভিন্ন আন্দোলনকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এঁরা। মহারাষ্ট্রে আর বাংলায় বিস্ফোরণের

পর বিস্ফোরণ চলছিলই—এর সঙ্গে যুক্ত হলো পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ। বিহার, উড়িষ্যা, রাজপুতনাতেও এর শাখা ছড়িয়ে দেওয়া হলো। সর্ব ভারতীয় নেতৃত্বেও অন্যতম রইলেন ভগৎ সিং।

ভগৎ সিং-এর বাবা সর্দার কিষেণ সিং এক সময় কৃষক আন্দোলনে অংশ নিয়ে পুলিসের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। ভগৎ সিং-এর কাকা সর্দার অজিত সিংকে রাজনৈতিক কারণে দেশান্তরী হতে হয়েছিল। সেই পরিবারের ছেলে ভগৎ সিং ছেলেবেলা থেকেই শপথ নিয়েছিলেন, দেশের শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা ছাড়া ইহজীবনে আর কোনোও বড় কাজ নেই। এবং ভগৎ সিং শুধু আবেগপ্রবণ ছিলেন না, তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে গভীর চিন্তার পরিচয় ছিল।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার জন্য লাহোরে বেরিয়েছে এক মিছিল, নেতৃত্ব দিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা লালা লজপৎ রায়। সম্পুর্ণ শান্তিপুর্ণ মিছিল। কিন্তু তবু তার ওপরেই পুলিস নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লজপৎ রায়ের বুকে পড়লো লাঠির ঘা, তার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

মৃত্যুর আগে তিনি বলে গেলেন, আমার ওপর যে আঘাত হানা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কফিনের ওপর পেরেক হয়ে ফিরে আসবে।

সারা দেশ এই ঘটনায় ধিক্কার জানালো। কিন্তু ভগৎ সিং-এর দল ঠিক করলেন, প্রতিশোধ নিতে হবে। ইংরেজকে জানাতে হবে, ভারতবাসী আর শুধু মুখ বুজে মার খাবে না।

যে পুলিস অফিসারটি লালা লজপৎ রায়কে প্রহারের জন্য দায়ী, সেই মিঃ স্কটকে মৃত্যুদণ্ড দিল বিপ্লবীরা। এবং এই মৃত্যুদণ্ড কার্যে পরিণত করার জন্য তিনজনের একটি দল এসে দাঁড়িয়ে রইলো সিনিয়র পুলিস সুপারের অফিসের সামনের রাস্তায়। অদূরেই ডি. এ. ভি. কলেজ এবং জেলা আদালত। সেখানে রাখা রইলো তিনটি সাইকেল।

নিখুঁত পরিকল্পনা, দলের আর একজন একটু দূরে অপেক্ষা করছে—সে স্কটকে চিনিয়ে দেবে। ভগৎ সিং চালাবে গুলি। ভগৎ সিংকে যদি কেউ আক্রমণ করতে আসে, তার ওপর গুলি চালাবে রাজগুরু। এরপর ওরা দুজন পালাবার সময় যদি কেউ বাধা দিতে আসে—তাহলে তাকে আটকাবার জন্য অস্ত্র হাতে স্বয়ং চন্দ্রশেখর আজাদ রয়েছেন পাহারায়।

নির্দিষ্ট সময়ে স্কটের বদলে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো আর একজন ইওরোপীয়ান অফিসার স্যাণ্ডার্স। এসে সে যখন মোটর সাইকেলে উঠতে যাচ্ছে—রাজগুরু আর দেরি না করে সোজা গুলি চালিয়ে দিল তার মাথায়। সে মাটিতে পড়ে গেল আছড়ে। একবার যখন গুলি মারা হয়েছে, তখন একে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না—হাসপাতালে সে আততায়ীদের চিনিয়ে দিতে পারে—তাই ভগৎ সিং নিজে এগিয়ে এসে পরপর পাঁচ-ছ'খানা গুলিতে তাকে শেষ করে নিশ্চিন্ত হলো। তারপর নির্ভীকভাবে হাঁটতে লাগলো রাস্তা দিয়ে।

এ সময় আর একজন ইওরোপীয়ান সার্জেণ্ট এবং চন্নন সিং নামে এক সেপাই তাড়া করে এলো ওদের। ওরা পেছন ফিরে সার্জেণ্টের দিকে গুলি চালালো—গুলি সার্জেণ্টের গায়ে না লাগলেও সে পিছলে মাটিতে পড়ে নিজের ঠ্যাং ভেঙে ফেললো। ওরা ছুটলো ডি. এ. ভি. কলেজের দিকে।

প্রায় যখন পৌঁছে গেছে, তখন দেখা গেল ওদের ঠিক পেছনেই চন্নন সিং। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চন্দ্রশেখর আজাদ বললেন, তুমি ভারতীয়, তোমাকে মারতে চাই না, ফিরে যাও। স্যাণ্ডার্সের দেহরক্ষী চন্নন সিং সে কথা না শুনে আরও এগিয়ে আসতেই আজাদ বাধ্য হয়ে তার তলপেটে গুলি করলেন।

তারপর দ্রুত ওরা উঠে পড়লেন ডি. এ. ভি. কলেজের ছাদে। পিল পিল করে পুলিস ছুটে আসছে ওদের ধরবার জন্য। এরা ততক্ষণে

কলেজের পেছনের দেওয়াল টপকে সাইকেল তিনটিতে উঠে বসে হাওয়া। পুলিস ওদের কোনো চিহ্নই খুঁজে পেল না।

পুলিস শুধু এইটুকুই জানতে পেরেছিল যে ঐ তিন বিপ্লবীর মধ্যে একজন ছিল দাড়িগোঁফওয়ালা, পাগড়িপরা শিখ যুবক। ভগৎ সিং কোনোদিন কোনো ধর্মে বিশ্বাস করতো না। পাগড়ি ছেড়ে দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেললো। কিছুদিন আত্মগোপন করে রইলো কলকাতায়। কলকাতায় তার বন্ধুর অভাব ছিল না। কলকাতা থেকে যতীন দাস আগেই তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বোমা বানানো শেখাতে গিয়েছিল। প্রখ্যাত বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর (মহারাজ) কাছেও ভগৎ সিং অস্ত্র সাহায্য চেয়েছিলেন।

কাশীতে একজন সি. আই. ডি'র ওপর আক্রমণ, পার্টির জন্য পোস্ট অফিসের টাকা লুঠ, পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লুণ্ঠনের চেষ্টা, স্যাণ্ডার্স হত্যা, লাহোর, সাহারাণপুর, বিলাসপুর, কলকাতা এবং আগ্রায় বোমা নির্মাণ—এই সবই ভগৎ সিং আর তার সঙ্গীদের কাজ।

এখানেই শেষ নয়। ভগৎ সিং-এর শেষ অ্যাকশান আরও চমকপ্রদ।

দিল্লীর লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে সরকার তাড়াহুড়ো করে পাবলিক সেফটি বিল পাশ করিয়ে নিতে যাচ্ছে—যে বিলের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতীয়দের রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করা। ১৯২৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী, বিলটি সবেমাত্র উত্থাপিত হয়েছে—ওপরের দর্শকদের গ্যালারিতে দুজন যুবক উঠে দাঁড়ালো, রেলিং-এর কাছে এসে ঝুঁকে দুটো বোমা ছুঁড়ে মারলো নীচে। প্রচণ্ড শব্দ। তারপরই উড়তে লাগলো হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টির ইস্তাহার—তার প্রথম লাইন :

"It takes a loud voice to make the deaf hear !"

ইস্তাহার ছড়িয়ে দেবার পর ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত মাথার ওপর হাত তুলে পিস্তল ছুঁড়ে চিৎকার করে বললো, আমরা দেশের

কাজ করতে এসেছি! তারপর পিস্তল দুটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শান্ত ভাবে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে বললো, আমরা কারুকে আঘাত করতে আসিনি।

দর্শকদের আসনেই এক প্রান্তে বসে ছিলেন ব্যারিস্টার আসফ আলি। তিনি এই যুবক দুটির সাংঘাতিক মনোবল স্বচক্ষে দেখেছেন। শুধু গুপ্ত হত্যা আর লুণ্ঠন নয়—ফরাসী বিপ্লবীদের আদর্শে, সারা দেশের লোককে জানবার জন্য দিল্লীর সংসদে বোমা ও ইস্তাহার ছড়িয়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর।

স্যাণ্ডার্স হত্যার সঙ্গে ভগৎ সিং-এর সম্পর্কের কথা পুলিস প্রথম জানতে পারেনি। একজন বিশ্বাসঘাতকের জন্য সেটাও জানাজানি হয়ে গেল।

একে একে ভগৎ সিং-এর বন্ধুরাও আসতে লাগলো জেলে। 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।' দেশের জন্য প্রাণ দিতে এদের কি নিদারুণ উৎসাহ। জেলখানাই যেন উৎসব বাড়ি। এক একজন গ্রেফতার হয়ে আসে আর অন্যরা হৈ হৈ করে তাকে স্বাগতম জানায়। ভক্তরা নাচ নেচে গান গেয়ে ওঠে। আদালতে এরা মুহুর্মুহু শ্লোগান দেয়, রাজসাক্ষীর দিকে জুতো ছুঁড়ে মারে। হাকিম হুকুম দেন এদের দমন করার জন্য সব সময় হাতে হাতকড়ি আর পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা হোক। তবু জেলখানা সরব হয়ে ওঠে ভগৎ সিং-এর নিজের লেখা গানে :

মেরা রং দে বসন্তী চোলা
মা, রং দে বসন্তী চোলা
ইস চোলে কো পহন শিবাজী খেলে আপনি জান সে
ইসে পহন ঝাঁসি কি রাণী মিট গই আপনি আনপে
আজ ইসি কো পহনকে নিকলা হম মস্তোঁকা টোলা
মেরা রং দে বসন্তী চোলা

দম নিক্‌লে ইস দেশকে খাতির বস ইতনা আরমান হ্যায়
এক বার ইস দেশ পে মরনা শো জন্মোকে সমান হ্যায়
দেখকে বীরোঁকি কুর্বানী আপনা মন ভি ডোলা
মেরা রং দে বসন্তী চোলা…

[মা, আমার কাপড় বাসন্তী রঙে রাঙিয়ে দাও। এই বসন পরেই শিবাজী নিজের প্রাণের খেলা খেলে গেলেন। এই বসনেই ঝাঁসীর রানী মিটিয়ে গেলেন নিজের শপথ। আজ সেই বসন পরেই আমরা বুঁদ হয়ে বেরিয়েছি।

দেশের জন্যই শেষ নিশ্বাস পড়ুক, শুধু এইটুকুই আমার ইচ্ছা। একবার এই দেশের জন্য মরণ শতবার জন্মাবার সমান। বীরদের আত্মদানের দৃষ্টান্ত দেখে আজ আমারও মন দুলে উঠেছে। মা, আমার কাপড় বাসন্তী রঙে রাঙিয়ে দাও!]

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ছাড়া মূল আসামী ছিলেন এই ক'জন :

শুকদেব ওরফে দয়াল ওরফে স্বামী ওরফে গ্রামবাসী। লায়ালপুরের রামলালের পুত্র।

রঘুনাথ ওরফে 'এম' ওরফে শিবরাম রাজগুরু। পুণার হরি রাজগুরুর পুত্র।

যতীন্দ্রনাথ দাস, কলকাতার ভবানীপুরের বঙ্কিমচন্দ্র দাসের পুত্র।

চন্দ্রশেখর আজাদ ওরফে পণ্ডিতজী। বারাণসীর বৈজনাথ রামের পুত্র।

ভগবতী চরণ ওরফে বি. সি. ভোরা। লাহোরের রায় বাহাদুর শিবচরণ দাসের পুত্র।

এর মধ্যে শেষ দুজন ফেরারী। আজাদ কোনোদিন ধরা দেননি আমরা জানি। ভগবতী চরণ বন্ধুদের জেল থেকে উদ্ধার করার জন্য নির্জন জঙ্গলের মধ্যে বোমা বানাতে গিয়ে সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত

হন। সেই সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন, আজকের বিখ্যাত হিন্দী লেখক যশপাল। যশপাল ভগবতী চরণকে রেখে ডাক্তার ডেকে আনতে এবং অন্য বন্ধুদের খবর দিতে চলে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন, ততক্ষণে ভগবতী চরণের শেষ নিশ্বাস পড়ে গেছে। সবাই মিলে তার মৃতদেহ ভাসিয়ে দিল নদীর জলে। ভগবতী চরণের স্ত্রী দুর্গা দেবী নিজের সব অলঙ্কার বিক্রী করে তিন হাজার টাকা পেয়ে পুরোটাই দিয়ে দিয়েছিলেন ভগৎ সিংদের মামলা চালাবার জন্য।

নীচু আদালতে ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্তর যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড হয়। তারপরেও জেলে তাদের ওপর অসহ্য অত্যাচার করা হতো। তাদের দেওয়া হতো যে খাদ্য—তা পশুরও অনুপযোগী। এ ছাড়া শারীরিক নির্যাতন তো ছিলই। ওরা দাবি তুললো, ওদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিতে হবে, দিতে হবে বইপত্র পড়ার সুযোগ। সরকার ঘৃণার সঙ্গে এ দাবী প্রত্যাখ্যান করলো এবং অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

প্রতিবাদে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর অনশন করলেন। জেলকর্তৃপক্ষ জোর করে খাওয়াবার সব রকম চেষ্টা করে যেতে লাগলো। একদিন আটজন পাঠান ওদের জোর করে মাটিতে ফেলে হাত পায়ের ওপর চেপে দাঁড়ালো, জেলের ডাক্তার জোর করে ওদের মুখে ঢোকালো খাবারের নল। এই দুই পরাক্রান্ত বিপ্লবী সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে রইলেন তবু। ভগৎ সিং-এর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, অজ্ঞান হয়ে গেলেন বটুকেশ্বর। পরদিন আদালতে শরীরের সেই ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে ভগৎ সিং চেঁচিয়ে উঠলেন, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্!

এই খবর পেয়ে যতীন দাস সমেত সমস্ত রাজবন্দীই অনশনে নেমে পড়লেন। হয় দাবী মেটাতে হবে, অথবা আমৃত্যু অনশন। সেই অনশন ভাঙার যতরকম বর্বর পন্থা আছে সবই গ্রহণ করেছিল

জেল কর্তৃপক্ষ। প্রথমে মারধোর ও শারীরিক অত্যাচার করে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা—তারপর জলও খেতে না দেওয়া।

ভারতের কমুনিস্ট পার্টির একদা সেক্রেটারী অজয় ঘোষ তাঁর "ভগৎ সিং অ্যাণ্ড হিজ কমরেডস্" বইতে সেই সময়কার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন:

অনশন ভাঙার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে জেল কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত আমাদের কুঁজোতে জলের বদলে দুধ রেখে দিয়েছিল। সেই সময়কার কষ্ট কল্পনাতীত। একদিন পরই তৃষ্ণতা অসহ্য হয়ে উঠলো। কুঁজোর কাছে গিয়ে জলের বদলে দুধ দেখেই সরে আসি। পাগল হয়ে যাবার মতন অবস্থা।...

নিজেকে আর বেশীক্ষণ বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বুঝতেই পারছিলাম, আর কয়েক ঘণ্টা পর নিজেকে আর আমি দমন করতে পারবো না—ঐ দুধই পান করে ফেলবো। আমার গলার ভেতরটা ছিঁড়ে গেছে, জিভটা ফুলে উঠেছে।—

শান্ত্রীকে ডাকলাম। গরাদের ওপাশে সে এসে দাঁড়ালে আমি তাকে অন্তত কয়েক ফোঁটা জল দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। সে বললো, পারবো না। হুকুম নেই।

রাগে আমার শরীর কাঁপতে লাগলো। আমি কুঁজোটা তুলে নিয়েই দরজার ওপর ছুঁড়ে মারলাম—সেটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল—দুধ ছলকে পড়লো সেপাই-এর গায়ে। সে ভাবলো, আমি সত্যি পাগল হয়ে গেছি। সে খুব ভুল করেনি।...

যতীন দাস অনশন করেছিলেন ৬৩ দিন। এই ইন্দ্রিয়জয়ী বিপ্লবীকে জোর করে খাওয়ালেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে বমি করে ফেলতেন। দিনের পর দিন তাঁর নাড়ীর স্পন্দন কমে আসতে লাগলো, চোখের জ্যোতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর—কিন্তু তাঁর মনোবল একটুও কমেনি। যতীনের সঙ্কটজনক অবস্থায় সারা দেশ আতঙ্কে, উদ্বেগে

স্তম্ভিত। তাঁর অনশনের বাহান্নতম দিনে সরকার রাজবন্দীদের সম্পর্কে নিয়ম কানুনগুলি পরীক্ষা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিলে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা অনশন প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু, যতীন দাস তখন ফিরে না আসার পথ ধরে ফেলেছেন। ১৯২৯-এর ১৩ই সেপ্টেম্বর, মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে যতীন দাসের জ্ঞান ফিরে এসেছিল—বন্ধুদের কাছে ডেকে কথা বললেন, বিদায় জানালেন। তাঁর শেষ কথা—স্থানীয় কালীবাড়িতে বাঙালী প্রথায় আমার শ্রাদ্ধ-শান্তি করার দরকার নেই। আমি বাঙালী নই, আমি ভারতবাসী।

দিল্লীর অ্যাসেম্বলিতে ভগৎ সিংয়ের হাতে যে পিস্তল পাওয়া গিয়েছিল—সেই একই পিস্তলের গুলিতে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করা হয়েছে—এই তথ্য যখন প্রমাণিত হয়ে গেল—তখন সবাই বুঝলো, ভগৎ সিং-এর নিশ্চিত ফাঁসী হবে। এর পর থেকেই রাজগুরু খুব গম্ভীর হয়ে গেল। রাজগুরু ছোট্টখাট্টো মানুষটি—দুর্ধর্ষ বিপ্লবী হলেও সব সময় হাসিঠাট্টায় সবাইকে মাতিয়ে রাখে। তার এই হঠাৎ পরিবর্তন দেখে সকলেই অবাক। সে আর হাসে না, গান গায় না। শেষ পর্যন্ত যখন তারও ফাঁসীর হুকুম শোনা গেল, সে আবার আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, বন্ধুদের জড়িয়ে ধরলো। তার ভয় হয়েছিল, সে যদি ফাঁসীর দড়ি থেকে বঞ্চিত হয়!

ফাঁসীর দণ্ড হলো তিনজনের। ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং শুকদেব। বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ বাকি আটজনের যাবজ্জীবন নির্বাসন।

সর্দার কিষেণ সিং পুত্রস্নেহে আপ্লুত হয়ে সরকারের কাছে প্রার্থনা জানালেন ভগৎ সিং-এর শাস্তি কমিয়ে দেবার জন্য। এই খবর শুনে ভগৎ সিং তাঁর পিতাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার খানিকটা অংশ :

> বাবা, ফাঁসী থেকে আমাকে রক্ষা করবার জন্য আপনি স্পেশাল ট্রাইবুনালের কাছে যে প্রার্থনাপত্র দিয়েছেন, সে খবর আমি শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারিনি।

আপনি যতটা ভাবছেন, ততখানি মূল্য নেই আমার জীবনের। অন্তত, আমার পক্ষে নিজের সিদ্ধান্তের গলা টিপে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার কোনো মূল্যই নেই।

বাবা, আমি ভয় পাচ্ছি যে আপনার এই ঘৃণিত কাজের নিন্দা করার সময় আমি হয়তো ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করে যাবো। সারা জীবন আপনি দেশভক্ত ছিলেন, একথা যদি আমি না জানতুম, তাহলে আপনাকে আমি সোজাসুজি দেশ-দ্রোহী বলে দিতাম।

বাবা, এখন আমাদের সকলেরই কঠোর পরীক্ষার সময়। বেশী নয়, শুধু এইটুকুই বলছি, আপনি এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি।···

ইতি—

আপনার স্নেহের ভগৎ

ভগৎ সিংকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন স্বয়ং গান্ধীজীও। সশস্ত্র বিপ্লবীদের তিনি কোনো দিন সমর্থন না করলেও এই বিপ্লবীদের প্রতি সারাদেশের সহানুভূতির চিহ্ন দেখে তিনি দরবার করেছিলেন ভাইসরয়ের কাছে।

ভগৎ সিং-এর উকিল প্রাণনাথ এসে জেলখানার মধ্যে জানালেন যে গান্ধীজী বার্তা পাঠিয়েছেন, ভগৎ সিং যদি হিংসাত্মক রাজনীতির নিন্দে করেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পথ একেবারে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্তের কথা বড়লাটকে চিঠি লিখে জানান, তাহলে ফাঁসীর দণ্ড মকুব হতে পারে।

সমস্ত রাজবন্দীরা এই প্রস্তাবে ধিক্কার জানালেন। ভগৎ সিং শুধু মৃদু হেসে বললেন, তিনি চিঠি লিখতে রাজী আছেন। তিনি ফাঁসীর হাত থেকে অব্যহতি পাবার জন্য আবেদন করবেন।

সকলকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তিনি এই চিঠি লিখলেন :

> আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আপনার আদালতই নির্ণয় করে দিয়েছে যে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই ছড়িয়ে দিয়েছি। বলাই বাহুল্য, আমরা সে ক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দী। সুতরাং, আমাদের প্রতি যুদ্ধবন্দীদের মতন ব্যবহার করাই উচিত—এই আমাদের একমাত্র বক্তব্য। অর্থাৎ, আমাদের ফাঁসীর দড়িতে ঝোলাবেন না, গুলি করে হত্যা করুন।
>
> —ভগৎ সিং

ভগৎ সিং শুধু বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধেই লড়াই করেননি। সেই যুগেই তিনি সমস্ত বিশ্বে এক শোষণহীন মুক্তসমাজের স্বপ্ন দেখতেন। আদালতে যখন তাঁকে 'বিপ্লব' কথাটার মানে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন :

Freedom is the imperishable birthright of all. The labour is the real sustainer of society. Soveriegnty of the people is the ultimate destiny of the workers. To the alter of this revolution we have brought our youth as incense, for no sacrifice is too great for so magnificent a cause. We are content. We await the advent of Revolution. Long live revolution

ফাঁসীর দিনও ভগৎ সিং নিবিষ্ট চিত্তে লেনিনের জীবনী পড়েছেন।

ভগৎ সিং-এর ফাঁসী কবে হবে, সে কথা অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। সর্দার কিষেণ সিংকে জেল কর্তৃপক্ষ চিঠি দিল, সমস্ত আত্মীয়স্বজন নিয়ে এসে ২৩শে মার্চ ভগৎ সিং-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু তখন তো ভগৎ সিং-এর আত্মীয় দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। জেলখানার দরজার বাইরে সমবেত হয়েছে এক বিশাল জনতা।

ভগৎ সিং-এর মহীয়সী জননীকে ঘিরে জনতার ব্যাকুলতা দুর্বার হয়ে উঠছে।

শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ এমন একটি কাজ করলেন, কারাগারের ইতিহাসে যার নজির নেই। সমস্ত ফাঁসীর দণ্ডই দেওয়া হয় ভোরবেলা। কিন্তু ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ সোমবার সন্ধে ৭টা ৩৩ মিনিটের সময় লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ভগৎ সিং, শুকদেব আর রাজগুরুর ফাঁসী হয়ে গেল।

ফাঁসীর মঞ্চ থেকে ভগৎ সিংয়ের শেষ ঘোষণা :

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ!

জেল কর্তৃপক্ষ চুপিচুপি এদের মৃতদেহগুলি নিয়ে সেই সন্ধে বেলাতেই চলে গেল শতদ্রু নদীর দিকে। তারপর আর তাঁদের দেহগুলির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ভগৎ সিং-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু তখন বিভিন্ন সভায় আবেদন জানালেন, "পদানত এই ভারতবর্ষ হাজার ভগৎ সিং চাইছে।"

৮

উত্তর ভারতে হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি পুলিসের অত্যাচারে ভেঙে তছনছ হয়ে গেলেও ঠিক সেই সময় বাংলার চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হলো ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি। চট্টগ্রামের কংগ্রেস কর্মীরাই এই বিপ্লবী বাহিনীর যোদ্ধা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীরা অনেকেই নিজেদের ছোট ছোট দল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসের পতাকার নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিশের দশকে গান্ধীজী যখন বললেন, অহিংস সত্যাগ্রহের পথে তিনি এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ এনে দেবেন—তখন বিপ্লববাদীরা তা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও গান্ধীজীর নীতিকে সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেল, স্বরাজ এলো না।

ত্রিশের দশকে আবার গান্ধীজী যখন লবণ আইন অমান্য করার ডাক জানালেন সারা দেশকে—এবং সেই উপলক্ষে পুলিস সারা দেশ জুড়ে অত্যাচারের তাণ্ডব শুরু করলো—তখন বিপ্লবীরা আবার অস্ত্র হাতে তুলে নিল। এবারে তাদের শক্তি ও দৃঢ়তা অনেক বেশী—এবার তারা সত্যিই সন্ত্রাস জাগিয়ে তুললো ইংরেজ শাসকদের বুকে।

পুলিসের আই. জি. লোম্যান সাহেব গেছেন ঢাকা পরিদর্শনে, সেখানকার বিপ্লবী তৎপরতা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। ঢাকার এস. পি. মিস্টার হাডসনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালে এসেছেন। ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট, সকাল সওয়া ন'টা। লোম্যান এবং হাডসন সঙ্গী সাথী পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হাসপাতালের

কম্পাউণ্ডে। ফর্সা সুন্দর চেহারার একটি যুবক এগিয়ে এলো সেদিকে। কোনো কথা না বলে গুলি চালালো। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। সাহেব দু'জনই পড়ে গেল মাটিতে। কাজ শেষ করে যুবকটি ফিরে যাচ্ছে শান্ত ভাবে—সত্যেন সেন নামে একজন সরকারী কণ্ট্রাক্টর দু'হাতে জাপটে ধরলো ছেলেটিকে। বিদ্যুৎ বেগে কুস্তির এক প্যাঁচে লোক-টিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ওপরের দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সবাইকে ভয় দেখিয়ে পালিয়ে গেল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বিস্ময়ে হতবাক্। প্রায় সবাই এ যুবকটিকে চেনে। ওর নাম বিনয় বসু, ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের শেষ বছরের ছাত্র—ভদ্র, বিনীত, প্রতিভাবান। এই বিনয় বসুই বাংলার সবচেয়ে দুঃসাহসিক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছে এর পরে। সব পরিচয় জেনেও পুলিস হাজার চেষ্টা করেও বিনয়কে ধরতে পারলো না। মুসলমান চাষীর ছদ্মবেশে বিনয় পালিয়ে এলো কলকাতায়। লুকিয়ে রইলো বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স দলের গোপন আস্তানায়।

পুলিসের আই. জি'র মতন এত উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসার এর আগে খুন হয়নি। তাই বিনয়ের খোঁজে পুলিস সারা দেশ একেবারে তছনছ করে ফেলছে। বিনয়কে বাঁচাবার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎ বোস, সুভাষ বোস প্রভৃতি স্থানীয় নেতারা গোপনে খবর পাঠালেন, বিনয়কে বিদেশে স্মাগল করে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তাঁরাই সব ব্যবস্থা করবেন।

বিনয় রাজী হয়নি। সে শুধু বলেছিল, আমি দ্বিতীয় অ্যাকশানেও যাবো।

সেই দ্বিতীয় অ্যাকশান ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে 'বারান্দার যুদ্ধ' নামে বিখ্যাত।

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর, দুপুর সাড়ে বারোটা। ইওরোপীয় পোশাকপরা তিনজন যুবক গটগট করে উঠে এলো রাইটার্স-বিল্ডিংস-

এর সিঁড়ি দিয়ে। বলাই বাহুল্য, এই তিনজনের মধ্যে দলপতির নাম বিনয় বসু। বাকি দুজন সুধীর গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত। সুধীরের ডাকনাম ছিল বাদল—সেই নামেই সে পরিচিত।

ওরা তিনজন এসে দাঁড়ালো কারা বিভাগের আই. জি. মিস্টার সিম্পসনের অফিসের সামনে। সাহেবের আর্দালি ওদের দেখে জিজ্ঞেস করলো আপনারা কি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান ? শ্লিপে নাম লিখুন আগে—

ওরা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো ভেতরে। সিম্পসন ক্রুদ্ধভাবে মুখ তুলে তাকালো।

এই সিম্পসনের আমলেই জেলখানার মধ্যে রাজবন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে সুভাষ-চন্দ্রকে এমন লাঠিপেটা করা হয়েছিল যে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ছিলেন।

সামনে সেই সিম্পসন। তাকে প্রতিরোধের কোনো সুযোগ না দিয়েই তিনজনের রিভলবার গর্জে উঠলো এক সঙ্গে। পাঁচ ছ'টি গুলিতে সিম্পসনের দেহ ফুঁড়ে গেল।

সমস্ত রাইটার্স বিল্ডিংস কেঁপে উঠলো সেই শব্দে। তার চেয়েও জোরে ওরা তিনজনে চেঁচিয়ে উঠলো, বন্দেমাতরম্।

ব্রিটিশ শাসনের প্রধান দুর্গ রাইটার্স বিল্ডিংসে সেই প্রথম শোনা গেল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। সিংহের গহ্বরে ঢুকে পড়েছে তিন অকুতোভয় যুবা। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল চতুর্দিকে—সবাই প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত—সরকারের বশংবদ দিশী মন্ত্রী এবং রাজ-কর্মচারীরা কেউ টেবিলের নীচে কেউ আলমারির আড়ালে লুকিয়ে ভয়ে কাঁপছে। আর প্রকাশ্যে বারান্দা দিয়ে খোলা পিস্তল হাতে সেই তিন যুবক বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে গুলি ছুঁড়ছে।

কৃষি বিভাগের সেক্রেটারি ওদের দিকে চেয়ার ছুঁড়ে মারলেন।

ওরা ফিরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়লো। ফিনান্স মেম্বারের ঘরের জানলার মধ্য দিয়ে গুলি চালালো। পুলিসের নতুন আই. জি. রিভলবার নিয়ে ওদের তাড়া করে এলেন—একটাও গুলি ওদের গায়ে লাগাতে পারলেন না। ওরা ততক্ষণে পাসপোর্ট অফিসে ঢুকে পড়েছে। উপস্থিত সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে পিস্তলে গুলি ভরে নিয়ে নতুন উদ্যমে বেরিয়ে এলো। জুডিসিয়াল সেক্রেটারি তাঁর ঘর থেকে যেই উঁকি মেরেছেন—ওদের এক গুলিতে তাঁর হাঁটু ফুঁড়ে গেল।

ততক্ষণে লালবাজার থেকে পুলিসের বড় কর্তারা সব দৌড়ে এসেছেন। সেপাই শান্ত্রী আটকে দিয়েছে সব পথ। গুলি বিনিময় করতে করতে ওরা আশ্রয় নিল বারান্দার শেষ ঘরে। সেখান থেকে চললো কিছুক্ষণ যুদ্ধ। প্রত্যেকটি গুলির শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে ওরা পালাবার জন্য আসেনি, এসেছে সম্মুখ যুদ্ধ করতে। এবং ওরা ধরা দেবে না।

এক সময় গুলি বর্ষণ থেমে গেল। ওরা সঙ্গে এনেছিল সায়নাইড বিষ এবং মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য একই সঙ্গে বিষ মুখে দিয়ে মাথায় গুলি চালিয়েছিল তিনজনে।

বাদল সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। দীনেশ চৈতন্যহীন। বিনয়ের তখনও জ্ঞান ছিল। পুলিসের দলবল ঘরে ঢোকার পর সে দৃপ্তকণ্ঠে বলে, আমার নাম বিনয় বোস, আমি ঢাকায় লোম্যানকে হত্যা করে এসেছি।

বিনয় ও দীনেশকে পাঠানো হয় জেল হাসপাতালে। তিনদিন পরে বিনয়ের আবার জ্ঞান ফিরে এলে সে অবাক হয়ে বলে, আমি এখনও মরিনি? সে কোনো রকম ওষুধ খেতে অস্বীকার করে—এবং ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে নিজেই তার মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে শেলাই ছিঁড়ে দেয়। সে ডাক্তারির ছাত্র ছিল, মৃত্যুকে সে নিজের শরীরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল।

দীনেশকে সরকার বহু যত্নে বাঁচিয়ে তুললো, সাড়ম্বরে ফাঁসী দেবার জন্য। কিন্তু দীনেশের আত্মাকে তারা স্পর্শ করতেও পারেনি। জেলখানা থেকে সে তার বউদিকে লিখেছিল, 'আমিই সে। আগুন আমাকে পোড়াইতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না। আমি অজর, অমর, অব্যয়।'

এক একটি হীরের টুকরোর মতন প্রাণ হারিয়ে যায়—আবার শত শত মণি মাণিক্য ঝলসে ওঠে অন্য এক আঁধার প্রান্তে। এ দেশে আত্মত্যাগী তরুণের কখনো অভাব হয়নি। পথের শেষ না জানুক তবু সত্যের অনুসন্ধানে তারা পথে বেরিয়েছে। প্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের কবি :

বাহির যদি হলি পথে
ফিরিস নে আর কোনো মতে
ফিরে ফিরে পিছন পানে
চাসনে বারে বারে।

জেল, গুলি, ফাঁসী—এসব ভয় তুচ্ছ হয়ে গেছে। শাসক শক্তির হাতে আর কোনো ভয়ের অস্ত্র নেই। নজরুলের এই গান তখন সকলের মুখে মুখে :

কারার ঐ লৌহ কবাট
ভেঙে ফেল, কর্ রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ!
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'!

…লাথি মার ভাঙরে তালা!

যত সব বন্দী শালায়—

আগুন জ্বালা

আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি!

বিপ্লবীদের লক্ষ্য এবার অব্যর্থ হচ্ছে। মেয়েরাও এগিয়ে এসেছে অগ্নিযুদ্ধে। বাঙালী মেয়েরা হারমোনিয়ামের ভেতরে লুকিয়ে রিভলবার নিয়ে যায়। কুমিল্লার কালেকটরের ডাক বাংলোর মধ্যে ঢুকে তাকে মেরে এলো দুটি স্কুলের মেয়ে, শান্তি আর সুনীতি। কনভোকেশনের সময় গভর্নরের কাছ থেকে ডিগ্রি নেবার বদলে, রিভলবারের গুলি ছুঁড়ে দেয় এক তেজস্বিনী ছাত্রী, বীণা দাস।

আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে চতুর্দিকে। মেদিনীপুরে পর পর তিন বছরে খুন হয়ে গেল তিনজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসীর হুকুম দিয়েছিল যে বিচারক তাকে আদালতের মধ্যেই হত্যা করলো একটি তরুণ। এরা এখন আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। শুধু দার্জিলিং-এর রেসকোর্সেই অত্যাচারী গভর্নর অ্যাণ্ডারসন অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গেলেন ভবানী ভট্টাচার্যের আক্রমণ থেকে।

কিন্তু সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম হয়েছিল চট্টগ্রামে। বহুকাল পর ভারতীয় যুবকরা বিদেশী শক্তির সঙ্গে প্রকাশ্য লড়াইতে নেমেছিল ভারতের মাটিতে। একদিনের জন্য তারা বিজয়ীও হয়ে অনেক উচ্চে তুলে দিয়েছিল ভারতের সম্মান। বিপ্লব আন্দোলনের সেই তৃতীয় পর্যায় শুরু।

চট্টগ্রামের মানুষ সূর্য সেন প্রথম যৌবনে ছিলেন একজন সামান্য স্কুলশিক্ষক। অতি সাধারণ ছোটখাটো পাতলা চেহারা, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার মতন মানুষ। সেই মানুষটির মধ্যে যে কী অসম্ভব তেজ ছিল, কেউ কল্পনাও করতে পারেনি সেদিন।

মাস্টারী ছেড়ে তিনি এক সময় হয়ে পড়লেন কংগ্রেসের সর্ব সময়ের কর্মী। 'সাম্য আশ্রম' নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠানও তিনি চালান। চট্টগ্রাম শহরের যুবকরা তাঁর অনুগামী—তারা খেলাধুলা, ব্যায়াম ও লোকহিতকর কাজ করে। সকলের মুখে মুখে সূর্য সেনের নাম মাস্টারদা। পুলিসের চোখে সন্দেহ করার মতন কিছু নেই। বরং, এই যুবক দলের তৎপরতায় চট্টগ্রাম শহরে চুরি-ডাকাতি-লুটপাট-ধর্ষণ ইত্যাদি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। এরা সমাজসেবী।

কিন্তু তলে তলে চলেছে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী গঠনের কাজ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক্যান আর্মি। তৈরী হচ্ছে আক্রমণের পরিকল্পনার খসড়া।

পরিকল্পনা নিখুঁত। একই সঙ্গে একই দিনে উড়িয়ে দেওয়া হবে রেল লাইন—যাতে বাইরে থেকে সাহায্য আসতে না পারে—ধ্বংস

করে দিতে হবে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস, যাতে বাইরে খবর না যায়।

আচম্বিতে পুলিস লাইন আক্রমণ করে দখল করে নিতে হবে অস্ত্র ও রসদ।

সঙ্গে সঙ্গেই লুণ্ঠন করা হবে সামরিক অস্ত্রাগার।

আর একটি দল পাহাড়তলীর ইওরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে মেরে ফেলবে উপস্থিত সভ্যদের—যাতে বাকি সাহেব সম্প্রদায়ও ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করে। এবং এই ভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিশোধও নেওয়া হবে।

দলের আটষট্টিজন নবীন সৈনিককে কয়েকটি দলে ভাগ করে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে রইলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রভৃতি। এদের শরীরে তারকাখচিত পূর্ণ সামরিক পোশাক। সত্যিকারের যুদ্ধ।

পরিকল্পনা মতন রেললাইন উপড়ে ফেলে একটা বগি এমনভাবে কাৎ করে রাখা হলো যাতে রেল চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস দখল করে বোমার ঘায়ে জখম করে দেওয়া হলো যন্ত্রপাতি।

১৮৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত সাড়ে দশটায় ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ভারতীয় সামরিক দল ছুটে গেল পুলিস লাইন ও অস্ত্রাগারের দিকে।

পুলিস লাইন ও সংলগ্ন পুলিস ব্যারাকে প্রায় সকলেই ছিল অসতর্ক। গাড়ি চেপে হঠাৎ বিপ্লবীরা এসে উপস্থিত হলো সেখানে—গেটের শান্ত্রী বাধা দেবার আগেই গুলি খেয়ে মরে গেল। তারপরও চললো দুমদাম গুলি বর্ষণ। বাকি সেপাই শান্ত্রীরা অস্ত্র হাতে নেবারও সময় পেল না। ভয় পেয়ে পালালো পড়িমড়ি করে।

বিপ্লবীরা টেনে ছিঁড়ে ফেললো ইউনিয়ান জ্যাক, রাইফেলগুলো লুঠ করে নিল।

সামরিক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করতেও বিশেষ বেগ পেতে হলো না। একজন সার্জেন্ট মেজর ও একজন শাস্ত্রী খুন হবার পর বাকিরা পর্যুদস্ত হলো। দরজা ভেঙে ফেলে ভেতরে ঢুকে ওরা দেখলো থরে থরে সাজানো রয়েছে ঝকমকে নতুন সব মেসিনগান, কার্বাইন ও বিচিত্র সব অস্ত্র। বিপ্লবীরা বিপুল উল্লাসে ফেটে পড়ে জয়ধ্বনি করে উঠলো। সিপাহী যুদ্ধের সময় বিজয়ী সিপাহীরা দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছেও সেখানকার অস্ত্রাগার দখল করতে পারেনি। পরাধীন ভারতে এই প্রথম একটি সম্পূর্ণ অস্ত্রাগার এলো ভারতীয়দের দখলে।

চট্টগ্রাম এখন মুক্ত। শহরের বিভিন্ন স্থান আক্রমণ ও অধিকার করে ছোট ছোট দলগুলি এসে সমবেত হলো পুলিস লাইনে। সেটাই পূর্ব নির্দিষ্ট হেড কোয়ার্টার। সেই রাত্রেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার। এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন সূর্য সেন। সূর্য সেন আপাদমস্তক সাদা পোশাকে সজ্জিত। মাথায় গান্ধী টুপীর মতন খদ্দরের শক্ত ইস্তিরি করা উষ্ণীষ। টুপিটির সামনে টাকার সাইজের উজ্জ্বল ধাতু নির্মিত ভারতবর্ষের প্রতীক। পরণে খদ্দরের লম্বা সাদা কোট, মালকোচা দিয়ে পরা ধপধপে ধুতি, আর টেনিস খেলার সাদা জুতো। বুকে ভেলভেটের তৈরী জরির কাজ করা ব্যাজ। এই অস্থায়ী সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি। কংগ্রেস অনুমোদিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে তার নীচে দাঁড়িয়ে তিনি পাঠ করলেন স্বাধীন সরকারের ঘোষণা :

প্রিয় বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ !

ভারতের বিপ্লবের গুরু দায়িত্ব আর ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর উপর ন্যস্ত।...

বিশ্বের গোচরার্থে ও স্বীকৃতির জন্য ভারতীয় গণতন্ত্র-বাহিনী

চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর শাসন ও শোষণের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছে।...

তরুণ বিপ্লবীরা নিজেদের সার্থকতার জয়ের উল্লাস শুরু করে দিল। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক পরেই অদূরবর্তী ওয়াটার ওয়ার্কসের জানলা থেকে ছুটে এলো মেসিনগানের গুলি। দুরন্ত বিপ্লবীরা টিলার ওপর শুয়ে পড়ে প্রতি আক্রমণ চালালো। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড রণ হুংকার, 'বন্দেমাতরম্'! চৌষট্টিজন ভারতীয় সৈনিক ভারতের মাটিতে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ যুদ্ধে নেমে পড়েছে।

কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর সাহেবদের দল থেমে গিয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করলো। তারা বুঝতেই পারেনি, বিপ্লবীরা সংখ্যায় কতজন। এই যুদ্ধে বিপ্লবীরা একজনও আহত হয়নি—সুতরাং প্রথম রাউণ্ডে তারা সম্পূর্ণ বিজয়ী। দলের ছেলেরা জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপালেও নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ইংরেজ জাত সহজে পিছু হটে না—তারা আবার ফিরে আসবেই।

বিপ্লবীদের পরিকল্পনার কয়েকটি ছোটখাটো হিসেবের ভুল ছিল—কিন্তু সেগুলিই মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। সেদিনটা ছিল ইস্টারের শনিবার—সাহেবদের পবিত্র ছুটির দিন। সেদিন তারা ক্লাবে যায় না। পাহাড়তলীর ইওরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে তারা একজনকেও মারতে পারেনি। যুব বিদ্রোহের সংবাদ পেয়েই ইওরোপীয়রা সংঘবদ্ধ হয়ে ডবল মুরিং জেটির অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে আসে। বিপ্লবীরা পথে পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করতেও ভুলে গিয়েছিল।

ওরা আর একটা জিনিস জানতো না। সামরিক নিয়মে একই জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখা হয় না। ওরা অস্ত্রাগার লুঠ করেছিল কিন্তু গুলি বা রসদের সন্ধান পায়নি। ঝকঝকে সব মেসিন-গান ও রাইফেল্স পেয়েও ব্যবহার করার উপায় নেই। রাগের চোটে

ওরা সেই সব অস্ত্র ভেঙেচুরে বা পুড়িয়ে নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। ওদের দখলে এসেছিল শুধু কিছু পুলিস বিভাগের মাস্কেট্রি—মেসিন-গানের তুলনায় যার শক্তি তুচ্ছ।

বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত নিলেন পুলিস লাইনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ওরা শহরের বাইরের পাহাড়ী এলাকায় আশ্রয় নিয়ে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালাবেন। চট্টগ্রামের আকাশ লাল করে জ্বলে উঠলো আগুন—পুলিস ব্যারাক দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো, কিন্তু অসাবধানে একজন বিপ্লবীর গায়েও আগুন ধরে গেল। সেই প্রথম অশুভ সঙ্কেত। তাকে নিয়ে কয়েকজনকে শহরে ফিরে যেতে হলো।

রাতের অন্ধকারেই বাকি সবাই চলে গেল পাহাড়ের দিকে। এখানে আরও দুটি ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল। কোনো কম্পাস বা ম্যাপ সঙ্গে না থাকায় পাহাড়ী এলাকায় পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এবং একটা যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা নিয়েও ওরা সঙ্গে পানীয় জল বা খাদ্যদ্রব্য কিছুই রাখেনি। তবু দুর্জয় সাহস আর অসম্ভব মনোবল নিয়েই ওরা অসাধ্য সাধন করেছে।

ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান পার্টির তরুণ সৈন্যদের তিনটি দিন কেটে গেল পাহাড়ে পাহাড়ে। চোখে ঘুম নেই। অসহ্য ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা—এদের মধ্যে অনেকেই পনেরো ষোলো বছরের বালক মাত্র।

এদিকে প্রথম চোটে মার খাওয়া বিভ্রান্ত সরকারপক্ষ আবার আস্তে আস্তে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। সুরমা উপত্যকা থেকে আনিয়ে ফেলেছে দেড় হাজার গুর্খা সৈন্য—হিংস্র নেকড়ের মতন তারা বিপ্লবীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সূর্য সেন পাহাড় থেকে কয়েকজনকে পাঠাবার চেষ্টা করলেন শহরের অবশিষ্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে খবর আনতে। কিন্তু তারা সক্ষম হলো না। কয়েকটি ছেলে খিদের জ্বালায় থাকতে না পেরে পাহাড় থেকে নেমে এসে খেতের তরমুজ ছিঁড়ে নিয়ে গেল

এবং চাষীদের চোখে পড়ায় পুলিসের কাছে খবর চলে গেল। একই সঙ্গে পুলিস ও মিলিটারি বাহিনী ঘিরে ধরলো জালালাবাদ পাহাড়।

সূর্য সেনের নির্দেশ ছিল, ফাইট আন টু দা লাস্ট। কেউ ধরা দেবে না। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে লুইস গান ও রাইফেল, এদের কাছে মাস্কেট্রি ও রিভলবার। যুদ্ধ শুরু হলো ২২শে এপ্রিল বিকেল পাঁচটায়। এই অপূর্ব ঐতিহাসিক যুদ্ধ চলেছিল আড়াই ঘণ্টা ধরে, এবং শেষ পর্যন্ত সরকারের সামরিক বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। চট্টগ্রামের বীর সৈনিকদের প্রবল আক্রমণের মুখে তারা দাঁড়াতে পারেনি। এই জয় গৌরবের স্থায়িত্ব যতই কম সময়ের হোক—এর তাৎপর্য অসাধারণ। ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্মান এই একটি ঘটনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

জালালাবাদের যুদ্ধে বিপ্লবীদের মধ্যে নিহত হয়েছিল বারো জন। সরকার পক্ষের কতজন নিহত বা আহত হয়েছিল সে তথ্য সরকার কোনোদিনই প্রকাশ করেনি। অবিচলিত সেনাপতির মতন সূর্য সেন নিহত সঙ্গীদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে, তাদের জন্য শুধু দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে—বাকি দল নিয়ে চলে যান। পরদিন সকালবেলা সরকারী বাহিনী এসে সেই বিপ্লবীদের মৃতদেহ এক জায়গায় স্তূপ করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা এর পর বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নানা জায়গায় আত্মগোপন করে। একদল চলে আসে কলকাতায়, একদল যায় পাহাড় ডিঙিয়ে বার্মায়, দূর দূরান্তের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে অনেকে। কিন্তু নেতা সূর্য সেন মূল ঘাঁটি চট্টগ্রাম ছেড়ে কোথাও যাননি এবং গোপন আস্তানায় থেকে একটার পর একটা অ্যাকশান চালিয়ে গেছেন।

চট্টগ্রামের ঘটনার খবর গোপন করার অনেক চেষ্টা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। তবু আগুনের মতন সেই খবর সারা দেশে ছড়িয়ে

পড়ে—এবং একই সঙ্গে গর্বে ও আশঙ্কায় সারা দেশের মানুষ এদের পরিণতি জানার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে এদের এক একটি দল ধরা পড়লেও অন্য দুর্ধর্ষ বিপ্লবীরা আবার একটা সাঙ্ঘাতিক কীর্তি করে দেশকে কাঁপিয়ে দেয়। কখনো শোনা যায় ফেনী রেল স্টেশনে এদের কয়েকজন পুলিসের হাতে ঘেরাও হলেও গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। চন্দননগরে কুখ্যাত টেগার্টের হাতে ধরা পড়বার আগেও এরা সম্মুখ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়ে যায়। বিশ্বাসঘাতক কিংবা অত্যাচারী পুলিস অফিসারদের মুণ্ডু এরা কেটে রেখে আসে রাতের অন্ধকারে। কুমিল্লা কিংবা ঢাকায় প্রকাশ্য দিনের আলোয় এরা অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গদের ওপরে গুলি চালিয়েও ধরা পড়ে না। জেল থেকে বন্ধুদের উদ্ধার করার জন্য এরা ডিনামাইট পর্যন্ত পুঁতে রাখে।

আর সূর্য সেন এক চমকপ্রদ নাম। পুলিসের সাধ্য নেই তাঁকে ধরা ছোঁওয়ার। তাঁর মাথার দাম দশ হাজার টাকা—সারা দেশময় তাঁর ছবিসমেত ইস্তাহার লটকানো। অথচ সূর্য সেন একদিনের জন্যও চুপ করে বসে নেই। নতুন নতুন ছেলেদের তিনি বিপ্লবে দীক্ষা দিয়ে নতুন কাজে পাঠাচ্ছেন। শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও। তখনকার দিনের বিখ্যাত ছাত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কল্পনা দত্ত ঘর সংসার ছেড়ে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই মানুষটির আহ্বানে।

চট্টগ্রাম শহর থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে ধলঘাটের একটা গুপ্ত আস্তানায় সূর্য সেন তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গীদের নিয়ে খেতে বসেছেন। রাত ন'টা বাজে—এমন সময় বাড়ির একটি বাচ্চা মেয়ে এসে খবর দিল, পুলিস।

খাওয়া ফেলে সবাই সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো। এদিকে ক্যাপটেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে কয়েকজন সেপাই ও হাবিলদার বাড়িটা

ঘিরে ফেলেছে। ক্যামেরণ একজন হাবিলদারকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো ওপরে। একজন বিপ্লবী এক ধাক্কায় হাবিলদারকে ফেলে দিল নীচে, আর একজন অতর্কিতে ক্যামেরণের বুকের কাছে রিভলবার নিয়ে গুলি চালালো; তারপর চললো অনবরত গুলিবিনিময়। সেই লড়াইয়ে নির্মল সেন এবং অপূর্ব সেন মারা গেলেও সূর্য সেন ছাদের ওপর থেকে পেছনের দেওয়াল ডিঙিয়ে প্রীতিলতাকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন চক্ষের নিমেষে।

দুই প্রিয় সঙ্গীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা অবিলম্বেই করলেন সূর্য সেন। যে ইওরোপীয়ান ক্লাব আগের বার ধ্বংস করা যায়নি—আবার তার ওপর আক্রমণ চালানো হলো। সূর্য সেন সমস্ত পরিকল্পনা ঠিক করে ছোট একটি দলের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন নিজে। দলের নেতৃত্ব দিলেন প্রীতিলতাকে। কারণ, এ দেশের মেয়েদের ওপর ইংরেজ যত অত্যাচার অবিচার করেছে, নারী সমাজের পক্ষ থেকেই তার সমুচিত উত্তর দেওয়া দরকার।

১৯৩২-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর আটজন সশস্ত্র সঙ্গীকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন প্রীতিলতা। যাবার আগে সূর্য সেনকে প্রণাম করে বলেছিলেন, মাস্টারদা, আশীর্বাদ করুন, হয়তো আর দেখা হবে না—।

সাহেবপাড়ায় তখন অত্যন্ত কড়া পাহারা। সেই পাহারা ভেদ করে কেউ আসতে পারে—একথা শাসকদের মনেও হয়নি। ক্লাব ঘরে সাহেব মেমরা হৈ হুল্লোড় করে হুইস্ট ড্রাইভ খেলায় মেতেছিল—বিপ্লবীরা হঠাৎ সেই ক্লাব বাড়ি ঘিরে ফেলে এক সঙ্গে আক্রমণ চালালো। ভয় পেয়ে প্রথমটায় তারা যেখানে সেখানে লুকোবার চেষ্টা করে, কেউ কেউ টেবিল, চেয়ার, কিংবা বাতিদান ছুঁড়ে আত্মরক্ষা করতে চায়।

সেই আক্রমণে আটজন পুরুষ বিপ্লবীর মধ্যে কেউ আহত হয়নি বা ধরা পড়েনি। ক্লাবঘর থেকে এক শো গজ দূরে শুধু প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রীতিলতা সামান্য আহত হলেও সে মৃত্যু বরণ করেছিল পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে। হয়তো আত্মহত্যার কথা সে আগে থেকেই ঠিক করে এসেছিল। সে বুঝেছিল, একজন নারী বিপ্লবীর পক্ষে পলাতক অবস্থায় আত্মগোপন করে থাকা কত কঠিন—এতে অন্য বিপ্লবীদেরও ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে।

তা ছাড়া, প্রীতিলতা সেদিন পালিয়ে গেলে সারাদেশ বিশ্বাস করতো কি করে যে একজন নারীও এ রকম অসম সাহসিক আক্রমণের নেতৃত্ব দিতে পারে ?

প্রীতিলতার কাছে পাওয়া গিয়েছিল ইংরেজিতে লেখা দীর্ঘ স্বীকারোক্তি। তাতে সে বলেছিল, আমি একজন স্বাধীনতার সৈনিক। মহান নেতা সূর্য সেনের নির্দেশেই আমি এ কাজ করেছি।

অদ্ভুতকর্মা সূর্য সেন ব্রিটিশের সমস্ত শক্তি তুচ্ছ করে দিয়ে অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারেন—দেশের লোকের যখন এরকম ধারণা হয়ে যাচ্ছিল—সেই সময় সময় একজন বিশ্বাসঘাতকের জন্য তিনি হঠাৎ ধরা পড়ে যান।

পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসের এক গভীর রাত্রে এক বিশ্বাস-ঘাতক পুলিস বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে সূর্য সেনের গোপন আস্তানায়। এবারও বিপ্লবীরা লড়াই করতে করতে পালাবার চেষ্টা করলেন। তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। অন্ধকারের মধ্যে সূর্য সেনও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে অন্যদিকে পালাচ্ছিলেন। একটা বেড়া পার হবার জন্য লাফ দিয়েই তিনি একেবারে পড়ে গেলেন একজন সিপাহীর গায়ের ওপর। গুর্খা সিপাহী মান বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো তাঁকে। এই

সময় পুলিসের রকেট বোমায় চতুর্দিক আলোয় আলো হয়ে গেল—সূর্য সেনকে চিনতে পেরে পুলিসরা হাতে একেবারে স্বর্গ পেল।

তখনও মাস্টারদার সঙ্গীরা এ'দিক ও'দিক থেকে গুলি ছুঁড়ছে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত পুলিস বাহিনী সেই বাড়িটা তল্লাশ করার সাহস পেল না। মাস্টারদা আর ব্রজেন সেনকে বেঁধে রাখা হলো খুঁটির সঙ্গে।

পরদিন সূর্য সেনকে হাতে ও কোমরে শিকল বেঁধে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হলো কাছাকাছি রেল স্টেশনে। 'মাস্টারদা বন্দী'—এ খবর আগুনের মতন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো—অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না। রেলের কামরায় সূর্য সেনকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছে—অসংখ্য মানুষের ভিড় তাঁকে এক পলক দেখতে চায়। একজন ইংরেজ সার্জেণ্ট সেই কামরায় ঢুকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, "Who is great Surja Sen—that old man?" এই বলেই সে সেই শৃঙ্খলিত মানুষটিকে ঘুঁষি মেরে অজ্ঞান করে ফেললো।

তিন মাস পর তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত ধরা পড়ে—বিচার শুরু হয় এক সঙ্গে।

অন্যান্য অনেক বিপ্লবী নেতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে—ধরা পড়ে একবার জেলে যাবার পর তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়তেন। তাঁরা মনে করতেন, নির্ভীকভাবে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরাই এখন তাঁদের একমাত্র কাজ। সূর্য সেন কিন্তু ধরা পড়ার পরও একটুও দমে যান নি। তিনি জেল থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করেছেন, বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, তাঁর নির্দেশ পাঠিয়েছেন।

তাঁর ফাঁসীর ঘটনাও অনন্য। তাঁকে ফাঁসী দেবার সময় ঠিক হয় রাত বারোটার পর। যাতে জেলের অন্যান্য বন্দীরাও কিছু টের না পায়। সেলের দরজা খুলে তাঁকে যখন বাইরে আনা হলো, তিনি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠলেন, বন্দেমাতরম্!

সেই শব্দে অন্যান্য কয়েদীদের ঘুম ভেঙে গেল, তারা ছুটে এলো নিজেদের দরজার কাছে। সূর্য সেন আবার বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতেই তারা সকলে কণ্ঠ মেলালো। তারপর চললো এই রকম। সূর্য সেন এক পা করে এগিয়ে বন্দেমাতরম্ বলছেন—শত শত কণ্ঠে তার উত্তর আসছে। এ যেন মৃত্যু যাত্রা নয়—এ যেন বিজয় মিছিল।

ইংরেজ কারারক্ষীদের এ ব্যাপার সহ্য হবে কেন? এই উল্লাস তাদের ভয় দেখানো যন্ত্রকে বিকল করে দিতে চায়। তারা মেরে মেরে সূর্য সেনকে থামিয়ে দিতে চাইলো। সূর্য সেন থামেননি। তখন সমবেত সিপাহী শান্ত্রী এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে সূর্য সেনের ওপর—মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে।

অজ্ঞান করে কিংবা সেখানেই একেবারে মেরেই ফেলে, তা জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায়—সূর্য সেন স্বেচ্ছায় ফাঁসীর দড়ি গলায় পরেননি। তাঁর অচেতন বা মৃত দেহটি টানতে টানতে এনে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সূর্য সেনকে মেরে ফেলেও সরকারের ভয় যায়নি। তাঁর মৃতদেহ থেকেই যদি উঠে আসে আবার কোনো ফিনিক্স পাখির মতন বিপ্লবী আত্মা! তাই, সেই রাত্রেই, ১৯:৪ সালের ১২ই জানুয়ারি—সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃতদেহ চুপিচুপি জেলখানা থেকে সরিয়ে এনে একটা জাহাজে তোলা হয়। জাহাজ বঙ্গোপসাগরের বুকে খানিকটা গিয়ে থামে—সেখানে ঐ দুই মৃতদেহ বস্তায় ভরে নামিয়ে দেওয়া হয় সমুদ্রের অতল জলে—হাঙর কুমীরের খাদ্য হবার জন্য।

১০

সূর্য সেনের মৃত্যুর পরই, মোটামুটিভাবে বলা যায়, পরাধীন ভারতের বিপ্লববাদীদের যুগ শেষ। কংগ্রেস তখন শাসনতন্ত্রের কিছু কিছু অংশ পেয়ে যাওয়ায় অনেকেরই মনে হলো—এই পথেই আস্তে আস্তে ক্ষমতার হস্তান্তর হবে। তরুণ তাজা বিপ্লবীদের প্রায় সকলকেই সরকার তখন জেলে ভরেছে, অনেককে মেরে শেষ করে দিয়েছে। প্রাক্তন, বয়স্ক, ক্লান্ত বিপ্লবীরা তখন আস্তে আস্তে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন কংগ্রেসের ছত্রছায়ায়—কেউ কেউ ফিরে যাচ্ছেন সংসার ধর্মে। মার্কসবাদও অনেককে আকর্ষণ করে নিয়ে গেল সংগঠনের পথে।

সূর্য সেনের মৃত্যুর পরও দু' এক বছর বাংলার নানা প্রান্তে ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। তবে, তার অধিকাংশই প্রতিশোধমূলক কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বিশ্বাসঘাতকদের ওপর বদলা নেবার জন্য কিংবা পুরনো শপথ পালন করার জন্য এখানে সেখানে আগুন জ্বলেছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রতিশোধের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪০ সালে। লণ্ডনে আবার ভারতীয় বিপ্লবীদের বন্দুক গর্জে উঠেছিল। মদনলাল ধিংড়ার পর এবার উধম সিং।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় উধম সিং ছিল একজন কিশোর। সে তার চোখের সামনে তার আত্মীয় বন্ধুদের জন্তু জানোয়ারের মতন নিহত হতে দেখেছে ইংরেজের গুলিবর্ষণে। সেই তখন থেকেই সে প্রতিশোধ নেবার বাসনা পুষে রেখেছিল—এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক মাইকেল ও' ডায়ারকে সে কখনো ভোলেনি।

মাইকেল ও' ডায়ার বিলেতে ফিরে এসে দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন বিশ হাজার পাউণ্ডের পুরস্কার। সম্রাটের কাছ থেকে পেয়েছেন নাইটহুডের খেতাব। এবং ক্রমাগত ভারতবাসীদের প্রতি ঘৃণা ছড়িয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন কোনো ভারতবাসী তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

বহু বছর কেটে গেছে। তিনি জানেন না, একজন তার পেছনে ছায়ার মতন ঘুরছে। ১৯৭০ সালের ১৩ই মার্চ তিনি কেনসিংটনের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বলে গেলেন—আমি বিকেল পাঁচটার মধ্যেই ফিরে এসে চা খাবো! ভারতীয় কুলিদের রক্ত মেশানো চা তাঁকে আর পান করতে হয়নি—তাঁর নিজেরই রক্ত ছড়িয়ে পড়েছিল লণ্ডনের মাটিতে।

ক্যাক্সটন হলে একটা মিটিং সবে শেষ হয়েছে। স্যার ও' ডায়ার সবার সঙ্গে করমর্দন করছেন। একজন সবল জোয়ান এগিয়ে সোজা পাঁচ ছ'টা গুলি ফুঁড়ে দিল তাঁর শরীরে। তারপর রিভলবার সমেত হাত শূন্যে তুলে সে গর্জন করতে লাগলো, আমার পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও!

প্রায় দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল সে—কিন্তু বেরুবার আগেই দুজন লোক ধরে ফেলে তাকে। এই লোকটির গায়ে অসীম শক্তি—সহজে ধরে রাখা যায় না—সাত আটজন মিলে এসে মাটিতে ফেলে গায়ের ওপর চেপে বসলো।

উধম সিং-এর কাছে পাওয়া গিয়েছিল পঁচিশ বছরের পুরনো একটা রিভলবার আর সেই রকমই পুরনো কার্তুজ। আদালতে সে বলেছিল, আমার নাম উধম সিং নয়, আমার নাম রাম মহম্মদ সিং আজাদ। অর্থাৎ সে ভারতের হিন্দু-মুসলমান শিখ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতীক হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। ফাঁসীর দণ্ড শুনে বলেছিল, আমি দেখেছি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের অধীনে আমাদের

দেশের কত লোক না খেয়ে মরে। দেশের কাজ করার জন্য আমি মরতে ভয় পাই না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে পরাধীন দেশের স্বাধীন হবার চেষ্টা, একটি ইতিহাসসম্মত প্রথা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য একটা সর্বাত্মক পরিকল্পনা করেছিল--কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য শেষ পর্যন্ত তা সার্থক হতে পারেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেশ অনেক বেশী প্রস্তুত, রাজনৈতিক তৎপরতা অনেক বেশী—কিন্তু বিপ্লবের জন্য ডাক দেবে কে?

বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী সংস্থাগুলি ততদিনে ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে গেছে—বিপ্লবী ছেলেরা, যারা তখনও ফাঁসীতে মরেনি, কারাগারের অন্ধকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ। বাংলার একটি বড় বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যে দল ভেঙে দিয়ে মিশে গেছে কংগ্রেসের সঙ্গে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী তখন ধাপে ধাপে অধিকার আদায়ের জন্য দর কষাকষি করছেন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে। আর এক দিকে, মহম্মদ আলি জিন্না সারা দেশের মুসলমান সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন মূল আন্দোলন থেকে। তাঁর দাবী তখন আর ভারতের স্বাধীনতা নয়, মুসলমানদের স্বাধীনতা।

বিপ্লবে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ তখন তাকিয়ে আছে একমাত্র সুভাষচন্দ্রের দিকে। সুভাষচন্দ্র কখনো কোনো গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে জড়িত ছিলেন না, তবু তিনিই ছিলেন অনেকের চোখে বিপ্লবী যৌবনের প্রতীক। সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এক সময় অনেকগুলি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র তখন ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি।

'৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার

সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তার প্রতিধ্বনি হিসেবেই যেন, ভারতের পক্ষ থেকে বড়লাট লর্ড লিনলিথগোও যুদ্ধ ঘোষণা করলেন জার্মানির বিরুদ্ধে। যেন ভারত একটা আলাদা দেশ নয়, তার জনসাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই। মহাত্মা গান্ধী সমেত যে সমস্ত কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে এতদিন আলাপ আলোচনা চলছিল—তাদের কিছুই জানানো হলো না পর্যন্ত। বোঝা গেল, ইংরেজ আসলে এইসব নেতাদের কতখানি গুরুত্ব দেয়!

কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে সুভাষচন্দ্র আগেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারত কোনো অংশ নেবে না এবং ভারতের জনবল ও সম্পদ এই যুদ্ধে ব্যবহার করায় সর্বপ্রকার বাধা দেবে। তা ছাড়া তিনি তুললেন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি। সারা দেশ জুড়ে তৈরী হোক সমান্তরাল সরকার এবং যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজকে পর্যুদস্ত করার জন্য দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি চলা দরকার।

অহিংসা নীতিতে স্থির বিশ্বাসী গান্ধীজী বিপদের সুযোগ নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে চান না। ইংরেজ এখন আক্রান্ত—এখন তার পশ্চাৎ আক্রমণ ন্যায়সঙ্গত নয়। যুদ্ধের গোড়ার দিকে অন্তত, তিনি বিনা শর্তে ইংলণ্ডকে সাহায্যদানের পক্ষপাতী ছিলেন।

শুরু হলো গান্ধী সুভাষ মতবিরোধ। জওহরলাল নেহরু এতকাল সুভাষের সমর্থক হয়েও শেষ পর্যন্ত বশীভূত হলেন গান্ধীজীর নীতিতে। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষকে ক্ষমতাচ্যুত করার বহুরকম কলা কৌশল শুরু হলো। অভিমানী সুভাষ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লক গড়লেন।

রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন সুভাষের মনে কখনো স্থান পায়নি। এই সময় হিন্দু-মুসলমান রাজনীতি প্রকট হয়ে ওঠায়

সুভাষচন্দ্র এর গতিরোধ করার কথা চিন্তা করেছিলেন। ডালহাউসিতে তখনও হলওয়েলের কুখ্যাত মনুমেণ্ট বিদ্যমান। সিরাজউদ্দৌল্লার কলঙ্ক মোচনের জন্য সুভাষ সেই মনুমেণ্ট ভেঙে ফেলার আহ্বান জানালেন ছাত্র-যুব সমাজের কাছে। হিন্দু ও মুসলমান সব শ্রেণীর মধ্যেই এই আবেদন সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের আগেই সরকার সুভাষকে জেলে নিক্ষেপ করলো।

সুভাষ আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন সরকারকে।

সেই ১৯২১ সাল থেকে সুভাষ বহুবার জেল খেটেছেন। জেলের মধ্যে তিনি দু'বার গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এবারের অনশন যে তাঁর স্বাস্থ্যে সইবে না, তা জানা কথা। সুভাষের হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে দেশব্যাপী যে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া হবে, তা বুঝতে পেরেই সরকার তাড়াতাড়ি তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখলেন।

বাড়ির বাইরে পুলিস পাহারা। বহু লোক সুভাষবাবুকে একবার চোখের দেখা দেখতে আসে এলগিন রোডে। কিন্তু সুভাষবাবু ছোট একটি ঘরে নিজেকে নির্বাসিত করেছেন, কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। অতি বিশ্বস্ত দু'একজন সহচরকে তিনি মাঝে মাঝে কথা বলার জন্য ডাকেন। তাঁরা দেখেছেন, সেই সময় সুভাষচন্দ্র কোনো এক নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য দাড়ি কামানো বন্ধ রেখেছেন, সব সময় পাঠ করছেন ধর্মগ্রন্থ, চেহারা অনেক রোগা হয়ে গেছে। এ যেন অন্য সুভাষচন্দ্র।

কিন্তু তলে তলে এক দুঃসাহসী পরিকল্পনা চলছিল। মনে পড়ে যায় আওরংজেবের নজরবন্দী শিবাজীর কথা। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি শেষরাত্রে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান করলেন। সারা ভারতবর্ষে ছড়ানো ব্রিটিশের এতবড় পুলিস ও গুপ্তচরবাহিনী তাঁর সন্ধান পেল না।

মৌলবীর ছদ্মবেশে সুভাষ সেই রাত্রেই গাড়িতে চেপে চলে এলেন ধানবাদ। পরদিন মাঝরাত্রে গোমো স্টেশন থেকে ধরলেন দিল্লী-কালকা মেল। বিনা বাধায় পৌঁছে গেলেন পেশোয়ার। সেখানে দু' দিন থেকে একজন সঙ্গীকে নিয়ে যাত্রা করলেন কাবুল। এখানে তাঁর পাঠানের ছদ্মবেশ, কিন্তু সুভাষচন্দ্র পাঠানের ভাষা জানেন না। তিনি মানুষজন দেখলে বোবা কালা সেজে থাকতেন। তাঁর নাম তখন জিয়াউদ্দীন।

পেশোয়ার থেকে ভারত সীমান্ত পার হতে হলে পেরুতে হবে কাবুল নদী। সহায় সম্বলহীন দুজন মাত্র মানুষ সেই নদী পার হলেন শুধু মনের জোরে। কতকগুলো চামড়ার মশক মাছধরা জাল দিয়ে বেঁধে বানানো হলো নৌকো—কোনো ক্রমে পৌঁছোলেন এসে এপারে।

কিন্তু এপারে আর কোনো যানবাহন নেই। রাত্রি নেমে এসেছে, দারুণ শীত। সারা রাত সেই খোলা জায়গায় কাটাতে হলে নিশ্চিত মৃত্যু। মাঝে মাঝে দু' একটা গাড়ি যায়, ওঁরা হাত দেখালেও থামে না। কিছু দূর হেঁটে এসে সুভাষ একটি কুয়োর পাশে গাছতলায় শুয়ে পড়লেন।

শেষ পর্যন্ত একটা মালভর্তি লরি দয়া করে থামলো। কিন্তু লরিতে তো বসার জায়গা নেই। চালকের কাছে কাকুতি মিনতি করে ওঁরা দুজন উঠে বসলেন লরির ছাদে মালপত্রের ওপরে। ছুরির মতন ধারালো শীতের হাওয়া, রাস্তার দু'পাশের গাছের ডাল-পালা লাগছে ওদের চোখেমুখে, যে-কোনো মুহূর্তে ছিটকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তবু লরি এসে কাবুলে পৌঁছোলো ওদের দুজনকে নিয়ে। সেখানে রেডিও ব্যবসায়ী উত্তম চাঁদের বাড়িতে আশ্রয় পেলেন।

সুভাষের পরিকল্পনা ছিল কাবুল থেকে রাশিয়ায় যাওয়া। সেখান

থেকে বার্লিন। যুদ্ধের প্রারম্ভে রুশ ও জার্মান মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ—এবং ইংরেজের শত্রু। এই দুই দেশের কাছ থেকেই তিনি সাহায্যের আশা করেছিলেন। কিন্তু কাবুলের রাশিয়ান মিশানের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো সুফল পেলেন না। দীর্ঘ ৪৩ দিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় কাবুলে—প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। কাবুলিওয়ালাদের মধ্যে একজন বাঙালীর পক্ষে ছদ্মবেশ ধরে এতদিন আত্মগোপন করে থাকা যে কি কঠিন কাজ, তা আর বিশেষ করে বোঝাবার দরকার নেই। অবশেষে ইটালির রাষ্ট্রদূতের মধ্যস্থতায় ইটালিয়ান ছদ্মনাম এবং পাশপোর্ট নিয়ে তিনি রুশ সীমান্ত পার হয়ে পৌঁছলেন মস্কোয়। পোশাক বদলে, দাড়ি কামিয়ে আবার সুভাষচন্দ্র বসু হলেন।

রুশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তার বিশেষ সুযোগ পাওয়া গেল না। বরং মস্কোয় জার্মান রাষ্ট্রদূত ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনেক খবরাখবর রাখতেন। তিনি নিশ্চিত সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলেন বার্লিনে।

ভারতের সংস্কৃতি, দর্শন ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জার্মান জাতির আগ্রহ সুবিদিত। সুভাষচন্দ্র জার্মান জাতিকে শ্রদ্ধা করলেও হিটলারকে কোনো দিনই পছন্দ করতে পারেননি। হিটলারও সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফলে এই দুজনের সম্পর্ক কখনো ভালো হয়নি। যুদ্ধের মাঝামাঝি অবস্থাতেই সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন—এ যুদ্ধে জার্মানির জেতার আশা কম। ইংরেজ শেষ পর্যন্ত জিতলেও এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়বে যে ভারতের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হবে।

সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন বার্লিন রেডিওর সাহায্য নিয়ে দেশবাসীকে সজাগ করে তুলতে। এবং প্রবাসী ভারতীয় সমর্থক এবং যুদ্ধে বন্দী ভারতীয় সেনাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে একটা বাহিনী গঠন করতে।

একটি দলকে সামরিক গুপ্তচর বৃত্তি শিক্ষা দিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে—তারা দেশের ভেতর থেকে জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে বিপ্লব শুরু করে দেবে। আর আফগানিস্তানের পথে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে সুভাষ সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতে ঢুকবেন।

নাৎসী সরকার তখন পূর্ব চুক্তি বাতিল করে রাশিয়া আক্রমণের কথা ভাবছে। সুতরাং রুশ-ভারত সীমান্ত ইংরেজকে বিব্রত করার জন্য সুভাষকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত। রেডিও ব্যবহারের অধিকার দিলেন এবং ড্রেসডেনের কাছে এক ক্যাম্পে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের জমায়েত করে দিলেন সুভাষের তত্ত্বাবধানে।

এদিকে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ব্রিটিশ ভারত থেকে সুভাষ-চন্দ্রের উধাও হয়ে যাবার ফলে হতচকিত ব্রিটিশ সরকার ঠিক করলেন, ভারতবাসীর মনে সুভাষচন্দ্র যাতে বীরের আসন না পান, তার সব রকম চেষ্টা করতে হবে। নানারকম মিথ্যা কুৎসা ছড়ানো হতে লাগলো তাঁর নামে। তাঁকে বলা হতে লাগলো দেশদ্রোহী, নাৎসীদের হাতের পুতুল। নরোয়ে দেশের বিশ্বাসঘাতক কুইসলিং স্বেচ্ছায় নাৎসী বাহিনীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল নিজের দেশে—সেই কুইসলিং-এর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হলো সুভাষ বসুর। এমনকি একবার রয়টার সারা পৃথিবীতে রটিয়ে দিল যে সুভাষচন্দ্র একটা বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

তখন রেডিওতে ভেসে উঠলো সুভাষের কণ্ঠস্বর। আজাদ হিন্দ বেতার থেকে তিনি বললেন, আমি সুভাষচন্দ্র বসু, এখনো বেঁচে আছি। আমি মরে গেলে ব্রিটিশ সরকারের অনেক সুবিধে হয় বটে, কিন্তু আমি বেঁচে আছি।

আর একটি ঘোষণায় তিনি বললেন, আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, আমার আনুগত্য যেমন চিরকাল ছিল তেমনি ভবিষ্যতেও থাকবে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের প্রতি।

জার্মানিতে সংগঠন অনেকখানি এগিয়ে যাবার পরেও সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারছিলেন, এখানে থেকে বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। তিনি ইতিমধ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে শুধু নাৎসীদের সুবিধে করে দেবার জন্য তিনি কিছুমাত্র উদ্যম ব্যয় করবেন না। বরং, ভারত স্বাধীন করার জন্য জার্মানির যতখানি সাহায্য পাওয়া যায়—তিনি সেটাই ব্যবহার করতে চান। কিন্তু জার্মানি সেই সাহায্য দেবার ব্যাপারে বারবার কথার খেলাপ করছে। ওদিকে দূর প্রাচ্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী জাপান বিদ্যুৎ গতিতে জয় করছে একটির পর একটি দেশ। ভারতের দ্বারপ্রান্তে তাদের পৌঁছে যেতে আর দেরী হবে না।

১১

এর মধ্যে ভারতে ও দূর প্রাচ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারত থেকে পলাতক রাসবিহারী বসু এখন জাপানের নাগরিক হলেও ভারতের স্বাধীনতার চিন্তা তাঁর মনে সব সময় জাগ্রত রয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে দেশ স্বাধীন করার জন্য তাঁর বিরাট পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও তিনি আবার সেই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তৎপর হলেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ স্থাপন করে তিনি মন দিলেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করার কাজে। ১৯৪১-এর শেষ দিকে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হলো ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। জাপান যে-সব দেশগুলি যুদ্ধে জয় করছে—সেখানকার ব্রিটিশ বাহিনীর মধ্যে বন্দী ভারতীয় সেনাদের মুক্তি দেওয়া হলো। জেনারেল মোহন-সিং-এর অধীনে তারা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অন্তর্ভুক্ত হযে গেল বেশ সহজেই।

দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে মিলিত হলেন টোকিওতে। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দেওয়া হলো সারা পৃথিবীতে।

সেই সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ হবে, তা পরিচালনা করবে শুধু মাত্র ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। এবং ভারতীয়রাই এই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেবে। তাঁরা জাপানের কাছ থেকে সামরিক সহযোগিতা

চাইবেন। এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা করবেন শুধুমাত্র ভারতীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই। এ ব্যাপারে জাপানের কোনো রকম হস্তক্ষেপ থাকবে না।

এরপর রাসবিহারী দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে জন সমর্থনের জন্য প্রচার চালাতে লাগলেন। ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের কাছে তিনি বেতারে আবেদন জানালেন, নিজেদের মধ্যে সব রকম বিভেদ ভুলে এখন শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে। এবং এই সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির শক্তি বৃদ্ধি হতে লাগলো।

সিঙ্গাপুরের পতনের পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ভারতের স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেও—পরবর্তী কয়েক মাসে জার্মানীর নাৎসী সরকারের মতনই জাপানের নিপ্পন সরকার ভারতীয়দের দাবিগুলি নিয়ে দর কষাকষি করে সময় নষ্ট করতে লাগলো।

জেনারেল মোহন সিং ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের শর্তগুলির পূর্ণ স্বীকৃতির আগে জাপানের সহযোগিতায় তাঁর বাহিনীকে যুদ্ধে নিযুক্ত করতে স্বীকৃত হননি। এই বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় মোহন সিং পদত্যাগ করলেন, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যও সরে গেলেন মোহন সিং-এর সঙ্গে সঙ্গে। রইলেন একা রাসবিহারী।

দীর্ঘকালের বিপ্লবী রাসবিহারী তখনবৃদ্ধ এবং ডায়াবিটিসেভোগার ফলে শরীর অশক্ত। তবু হাল ছাড়লেন না। এতখানি এগিয়ে এসেও সব কিছু নষ্ট হতে দিলেন না তিনি। তাঁর নিরলস পরিশ্রমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব অটুট রইলো।

এর আগেই ব্যাংকক সম্মেলনে ভারতীয় প্রধানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ইওরোপের সমরাঙ্গন থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে প্রাচ্যে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। রাসবিহারী নিজে উদ্যোগ

করে সুভাষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এখন তিনি প্রতীক্ষায় রইলেন সুভাষচন্দ্রের আগমনের ক্ষণটির জন্য।

ইতিমধ্যে ভারতে এক অনর্থক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়ে গেল। মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে কংগ্রেসের মনোভাব যা ছিল— ১৯৪২ সালে মহাযুদ্ধের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় সেই মনোভাবও অনেক বদলেছে। জাপান রেঙ্গুন জয় করে ভারতের একেবারে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। অনেকেরই তখন ধারণা, এ যুদ্ধে ইংরেজের জয়ের আশা নেই। আসাম ও বাংলাদেশ থেকে পিছু হটবার জন্য ইংরেজ তখন তৈরি—জাপানীরা যাতে সাহায্য না পায়—সেইজন্য পূর্ব বাংলার সমস্ত নৌকো বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যের মধ্যে যাতে বিশৃঙ্খলা না দেখা দেয়—সেইজন্য ভারতীয় নেতাদের ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে চার্চিল সাহেব পাঠালেন ক্রিপস মিশন।

জিন্না তখন ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তানের দাবিতে অনড়। কংগ্রেসের মধ্যে এক রাজাগোপাল আচারি ছাড়া আর কেউ ভারত বিভাগের কথা স্বপ্নেও স্থান দিতে চায় না। ভারতের কমুনিস্ট পার্টি তখন বিভিন্ন অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নে ভারত বিভাগ ব্যাপারে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে। পরস্পর বিরোধী দাবি এবং ব্রিটিশ সরকারের কৌশলে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়ে গেল।

দেশের জনগণ উত্তাল, অসহিষ্ণু। একটা কিছু করা দরকার। হঠাৎ গান্ধীজী ঠিক করলেন, দেশব্যাপী একটা আন্দোলনের হুমকি দিলেই যুদ্ধে আহত ইংরেজ তাল সামলাতে পারবে না। স্বেচ্ছায় ভারত ছেড়ে চলে যাবে।

বোম্বাই-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি পাশ করলেন আগস্ট প্রস্তাব। তাতে বলা হলো :

ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের

মন আশায় ও উৎসাহে পূর্ণ হবে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ওপরেই মহাযুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে।

জনসাধারণ যেন ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অনুগত সৈন্যের মতন তাঁর আদেশ মেনে চলে। এবং তারা যেন মনে রাখে, অহিংসাই এই আন্দোলনের ভিত্তি। দেশের মন্ত্র হবে,

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

ইংরেজ ভারত ছাড়ো।

এই প্রস্তাব গ্রহণের পরদিন, ৯ই আগস্ট সকালেই ইংরেজ সরকার গান্ধী-নেহরু সমেত সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করলো। দেশের মানুষ রাগে ফেটে পড়লো। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতৃত্ব-হীন, পরিকল্পনাহীন বিপ্লবে মেতে উঠলো। টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেল লাইন উপড়ে, থানা দখল করে শুরু হয়ে গেল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংগ্রাম।

ইংরেজ ভয় পেয়ে দেশ ছেড়ে পালালো না। বরং নৃশংস অমানুষিক পদ্ধতিতে সেই আন্দোলন দমন করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চল কিছুদিনের জন্য ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হতে পেরেছিল— তারপরই মিলিটারি ও পুলিস মেদিনীপুর, বালিয়া ও সাতারা জেলায় শুরু করে দিল তাণ্ডব। এমনকি বিমান থেকেও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করা হয়েছে জনতার ওপর।

সরকারী হিসেব মতেই, এই কাণ্ডারীহীন আকস্মিক বিপ্লবে, ২৫০টি রেল স্টেশন, ৫০০-র বেশী ডাকঘর এবং ১৫০-র বেশী থানা আক্রান্ত হয়েছিল। সরকার এর প্রতিশোধ নিয়েছে ৫৩৮টি জায়গায় গুলি চালিয়ে ১৪০ জনকে নিহত এবং ১৬৩০ জনকে আহত করে। ৬০ হাজারের বেশী গ্রেপ্তার এবং ১৮ হাজার ভারত রক্ষা আইনে বন্দী।

ভারতীয় নেতাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাহীন এক দুর্বল নীতির জন্য বহু প্রাণ এবং বিপুল ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হলো।

১৯৪৩-এর জুন মাসে সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে করে পেনাং হয়ে এসে পৌছোলেন টোকিওতে। রাসবিহারী নিজে সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে এলেন সিঙ্গাপুর। এক বিরাট জনসমাবেশে রাসবিহারী আবেগ-কম্পিত গলায় বললেন, আমি আপনাদের কাছে আজ কি উপহার এনেছি, দেখুন!

সুভাষের দিকে ফিরে বললেন, একে এনেছি।

আপনাদের কাছে, ভারতের কাছে অথবা পৃথিবীর কাছে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর কোনো পরিচিতির দরকার নেই।

He symbolises all that is best, noblest, the most daring and the most dynamic in the youth of India.

রাসবিহারী সর্বাধ্যক্ষের পদ তুলে দিলেন সুভাষের হাতে।

সুভাষ নতুনভাবে ঢেলে সাজালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। নাম দিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। এই ফৌজে বৃত্তি ও পেশা অনুযায়ী—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ—সকলের সমান অধিকার। এমন কি নারীদের নিয়েও তৈরী হলো আলাদা বাহিনী।

৫ই জুলাই সমবেত সেনাবাহিনীর সামনে সুভাষচন্দ্র দিলেন তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ:

কমরেডস! সৈনিক! তোমাদের রণহুংকার হোক, চলো দিল্লি!

এই স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষে আমাদের মধ্যে কে কে বেঁচে থাকবে, আমি জানি না। কিন্তু আমি একথা জানি, শেষ পর্যন্ত আমরা জিতবোই! আমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা যত দিন না লালকেল্লায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবরখানায় বিজয় উৎসব না করবে—ততদিন আমাদের বিশ্রাম নেই।

আমি কথা দিচ্ছি, অন্ধকারে কিংবা আলোয়, দুঃখে কিংবা সুখের

সময়, যন্ত্রণায় কিংবা জয়ের দিনে—আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে থাকবো। আজ তোমাদের দেবার মত আমার কিছুই নেই, শুধু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কষ্ট, পদযাত্রা আর মৃত্যু ছাড়া! স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখে যাবার জন্য শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কে কে বেঁচে থাকবে, তাতে কিছু আসে যায় না। ভারত একদিন স্বাধীন হবে—এই তো সবচেয়ে বড় কথা—এবং এই স্বাধীনতার জন্য আমরা আমাদের যথাসর্বস্ব দিয়ে যাবো।...

দিল্লির পথই স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লি!

সুভাষের আগমনে মালয়, সিঙ্গাপুর, বার্মা প্রভৃতি অঞ্চলের ভারতীয়দের মধ্যে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য দেখা দিল। সুভাষের রাজনৈতিক জীবন, দীর্ঘকাল ইংরেজের সঙ্গে তাঁর লড়াই এবং কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তাঁর আপোষহীন নীতির জন্য তাঁর খ্যাতি আগেই বহুবিস্তৃত ছিল—এখন তাঁর সশরীর উপস্থিতি এবং দৃঢ় বিশ্বাসময় অগ্নিগর্ভ ঘোষণা শুনে দলে দলে মানুষ যথাসর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। একটি সভায় সুভাষের গলার ফুলের মালা নিলামে বিক্রি হয়েছিল বারো লক্ষ টাকায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের অর্থাভাবের চিন্তা রইলো না— সেনাবাহিনীতে ছাড়াও বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজেও স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যেতে লাগলো হাজার হাজার।

জাপানের সঙ্গে সমান সমান ভাবে সম্পর্ক রাখার জন্য সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার। ইওরোপের বিভিন্ন পরাজিত দেশগুলির অস্থায়ী সরকার তখন দেশের বাইরে লণ্ডন থেকে কাজ চালাচ্ছে। সুভাষের রাষ্ট্রপতিত্বে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার কাজ চালাতে লাগলো সিঙ্গাপুর থেকে। ১৯৪৩-এর তেইশে অক্টোবর দুপুর সোয়া বারোটার সময় আজাদ হিন্দ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে। ভারতে তখন ব্রিটিশ ও মার্কিনী সৈন্যরা একযোগে কাজ করছে।

এই অস্থায়ী সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানিয়েছিল জাপান, বার্মা, ক্রোয়াশিয়া, জার্মানি, চীনের জাতীয় সরকার, ইটালি, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি।

ভারতীয় স্থল ভূভাগে জাপানের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না—এই দাবির স্বীকৃতি অনুযায়ী জাপান সরকার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তুলে দিল আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে। দ্বীপ দুটির নতুন নামকরণ হলো শহীদ ও স্বরাজ। সেখানে উড়লো ভারতের জাতীয় পতাকা, ব্যাণ্ডে বেজে উঠলো জাতীয় সঙ্গীত।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন ঐতিহাসিক সেলুলার জেলের সামনে। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে কত স্বাধীনতা সংগ্রামী এই কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিগুলোতে আয়ুক্ষয় করেছেন। অত্যাচারে নিগ্রহে কেউ কেউ পাগল হয়ে গেছেন, কেউ শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন এখানেই। তাঁদের স্বপ্ন সার্থক করে আজ এই জেলখানার সামনেই প্রথম স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়তে দেখা গেল। ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩।

আন্দামান নিকোবরের ব্রিটিশ চীফ কমিশনার তখন পলাতক। তার প্রাসাদে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন, দিল্লীর বড়লাটের বাড়িতেও এই পতাকা শিগগিরই একদিন উড়বে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে ভারতের সব প্রদেশের লোক ছিল। সুভাষচন্দ্র তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এমনভাবে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন যাতে নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল অটুট। এই ফৌজে প্রায় ১৪০০ অফিসার এবং পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন, এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হতে পারলে ভারতের জনগণের মধ্যেও একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটবে, ভারতীয় নেতারা কিছুতেই এ সুযোগ নষ্ট হতে দেবেন না। তখন দেশের অভ্যন্তর ও বাইরে থেকে যুগপৎ আক্রমণে ব্রিটিশের প্রতিরক্ষা শক্তি ভেঙে পড়তে দেরী হবে না। তিনি গান্ধীজী ও জওহরলাল প্রমুখের

নামেও তাঁর এক একটি ব্রিগেডের নামকরণ করেছিলেন। গোপনে জলপথে ও স্থলপথে ভারতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর দূতদের—দেশের জনমত জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ সত্যিই যখন ভারত সীমান্তে উপস্থিত হলো, সেদিন দেশের ভেতর থেকে কোনো সাহায্যই পাওয়া গেল না।

সুভাষের দূতরা এদেশে প্রবেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে, কয়েকজন প্রাণ দিয়েছে ফাঁসীর দড়িতে। বেয়াল্লিশের বিপ্লবের পর অসম্ভব মার খেয়ে দেশের লোক ধুঁকছে। বড় বড় নেতারা এবং দেশের যুবশক্তি কারাবদ্ধ। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পর বাংলা দেশ তখনও মুমূর্ষু অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। টাটা, বিড়লা, ইস্পাহানি প্রভৃতি ব্যবসায়ীর দল যুদ্ধের দৌলতে এমনই ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে দেশ স্বাধীন করার ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা নেই—বরং যুদ্ধ যত বেশী দিন ধরে চলবে, তত বেশী লাভ।

তাছাড়া, সুভাষ বোস যে বিশ্বাসঘাতকের মতন জাপানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে ভারতবর্ষে—ব্রিটিশের এই প্রচারেরও বিরতি নেই। অনেক ভারতীয় রাজনীতিবিদও এই সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলেন। যুদ্ধের ডামাডোলে, নানান দেশের মিথ্যে কথার ফুলঝুরিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিতির সঠিক তাৎপর্যই বুঝতে পারেনি সাধারণ মানুষ।

সেই সময়কার পররাজ্য লোলুপ জাপান শেষ পর্যন্ত সত্যিই ভারতের স্বাধীনতা মেনে নিত কিনা—সেটা ঐতিহাসিক জল্পনার বিষয়। যে-জাপান চীনের ওপর বীভৎস অত্যাচার চালিয়েছে, তার সাহায্য গ্রহণ করা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয়েছিল কিনা সেটাও তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু একথাও সত্যি, একজন জাপানী সৈন্যও ভারতের মাটিতে পা দেয়নি—এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সব রকম সামরিক শিক্ষা ও সংগঠনই ছিল শুধু ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ভারতীয়

ভাষায়। ভারতীয়দের স্বতন্ত্র অধিকারের কথা সুভাষচন্দ্র বারবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই বোধহয় জাপানীদের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য পাননি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই তিনি একবার ঘোষণা করেছিলেন যে, "আমার কি এতই বুদ্ধি কম যে ওরা আমাকে বোকা বানাবে? বিশ্বাস করুন আমাকে, জাপানীরা কখনই আমাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে জুয়াচুরি করতে পারবে না। আমাদের সাবধান থাকতে হবে, শুধু আমাদের শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই নয়—জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং কিছু কিছু ভারতীয়ের সম্পর্কেও!"

আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথম যুদ্ধ শুরু করে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ সালে, আরাকানের পার্বত্য এলাকায়। মোট একবছর তিনমাস তারা যুদ্ধ চালিয়েছিল। রসদ, গোলাবারুদ, যানবাহনের অভাব ছিল তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। বার্মা ও আসামের দুর্ভেদ্য পাহাড় ও জঙ্গলে আশ্রয়হীন অবস্থায় তারা অকুতোভয় লড়াই চালিয়েছে—এবং প্রথম দিকে যে শৌর্য ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়েছে, তা আমাদের চিরকাল গর্ব করার মতন।

ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল—এই তিনমাস আজাদ হিন্দ ফৌজের বিজয়গতি অব্যাহত থাকে। মার্চের মাঝামাঝি কেনেডি পীকে উঠে ভারতীয় সৈন্যরা যখন ভারতের সীমানা দেখতে পেল তখন বিপুল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়েছিল। ১৮ই মার্চ তারা দলে দলে ভারত সীমান্ত পার হয়ে তুলে দিল স্বাধীনতার পতাকা। একের পর এক সীমান্ত চৌকি ও গ্রাম দখল করে তারা এগিয়ে আসতে লাগলো। কোহিমার কাছাকাছি এসে তীব্র সঙ্ঘর্ষের পর পিছু হটে গেল ব্রিটিশ বাহিনী। কোহিমা দখল করে মুক্তিবাহিনী আরও এগিয়ে যেতে লাগলো। আর একটি বাহিনী ভারত বার্মা সীমান্তের দক্ষিণ দিক দিয়ে ঢুকে পড়ে খুলে দিল দ্বিতীয় ফ্রন্ট।

বেতারে সুভাষচন্দ্র আবার দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানালেন সহযোগিতার জন্য। তিনি বললেন, ভারতের মাটি থেকে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য নিশ্চিহ্ন হলে দেশে জনগণের অনুমোদিত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

বর্ষাকাল নেমে আসার পর যুদ্ধের গতি আবার অন্যদিকে ফিরে গেল। আসামের পাহাড়ে দুর্ধর্ষ বর্ষা, সেখানে সাজসরঞ্জামহীন, আশ্রয়হীন যোদ্ধার দল কোন শক্তিতে লড়বে সুশিক্ষিত শত্রু সেনার সঙ্গে। ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনী এই সুযোগে প্রবল শক্তিতে চাপ দিয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছু হটতে লাগলো, প্রাণ হারালো হাজার হাজার সৈনিক। জাপানীদেরও বিজয় অভিযান এখন বাধা পেয়েছে। অন্যান্য রণাঙ্গনে পরাজয়ের ফলে ভারতীয় মুক্তিসেনাদের সাহায্য করার উৎসাহ জাপানীদের ক্রমশ কমতে লাগলো। ১৯৪৫ সালের ১৩ই মে পেগুতে আজাদ হিন্দ ফৌজের শেষ বাহিনীটিও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

জার্মানিতে সুভাষচন্দ্র যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী তৈরী করে এসেছিলেন তাদের রাখা হয়েছিল বিস্কে উপসাগরের তীরে সামরিক শিক্ষার জন্য। সময় মতন তারা অন্যদিক থেকে ভারত সীমান্তে চলে আসবে। নর্মাণ্ডি আক্রমণের সময় জার্মান বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও পিছু হটে আসতে হয়। তাদের প্রায় ২০০ জন পথেই মারা যায়, দেড়শো জনকে মার্কিন ইংরেজ বাহিনী বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করে। বাকি সবাই বন্দী হয়।

সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি জাপানের কাছ থেকে সাহায্য চাইবার জন্য লজ্জিত নই। এককালের মহা শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও যদি ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়তে পারে, আমেরিকার কাছে হাঁটু গেড়ে সাহায্য চায়—তাহলে আমাদের মতন

পদানত এবং নিরস্ত্র জাতি কেন আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নেবে না ?

আধুনিক কালের ইতিহাস থেকে এমন একটাও দৃষ্টান্ত কি কেউ দেখাতে পারবে—যেখানে কোনো পরাধীন দেশ কোনো রকম বিদেশী সাহায্য না নিয়েই স্বাধীন হতে পেরেছে ?"

সুভাষচন্দ্রের দুর্ভাগ্য, তিনি যাদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে গিয়েছিলেন, সেই জার্মানি ও জাপানই হেরে গেল।

যে জেতে, তার হাতে অনেক যুক্তি থাকে। যে হারে, তার বহু দোষ। বিজয়ী শক্তি তার নামে যদৃচ্ছা দোষারোপ করতে পারে। সুভাষচন্দ্র বসু শেষ পর্যন্ত জিততে পারলেন না।

সুভাষচন্দ্রের শেষ পরিণতি রহস্যে ঢাকা। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট ফরমোজার তাইহকু বিমান বন্দর থেকে তিনি কোন গুপ্ত জায়গায় যাবার সময় বিমানে আরোহণ করার একটু পরেই বিমানে আগুন লাগে এবং অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জাপানী সামরিক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যুর যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাতে অনেকেরই বিশ্বাস নেই।

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হোক বা না হোক, তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হবার পরেও তাঁর প্রভাব অসম্ভব বেড়ে যায়। মাইকেল এডোয়ার্ডস-এর ভাষায় : The Ghost of Subhas Bose, like Hamlet's father, walked the battlements of the Red Fort and his suddenly amplified figure overawed the conferences that were to lead to independence.

আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের যখন দিল্লীর লালকেল্লায় বিচারের জন্য আনা হয়, তখন সারাদেশে বিপুল আড়োলন পড়ে গেল। তাদের মুক্তির দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বেরিয়ে পড়লো গ্রামে নগরে। কলকাতার ছাত্রদের ওপর পুলিস গুলি চালায়—কিন্তু লাঠি,

কাঁদানে গ্যাস আর গুলি দিয়ে এদেশের মানুষকে দমন করার স্তর তখন পেরিয়ে গেছে। জওহরলাল নেহরু সুভাষের সংগ্রাম অভি-যানের প্রতি প্রকাশ্যে বিরূপতা জানিয়েছিলেন—কিন্তু এখন জনগণের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পেরে, জীবনে প্রথম ব্যারিস্টারের পোশাক পরে লালকেল্লায় গেলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের জওয়ানদের পক্ষ সমর্থন করতে।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধে সার্থকতার চেয়েও একটা বড় সার্থকতা আছে। দেশীয় সৈন্যদের নিয়ে সম্পূর্ণ সামরিক পদ্ধতিতে কোনো দেশীয় নেতার পক্ষে যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো সম্ভব, তার একটা পরীক্ষা হয়ে গেল। এর পর ভারতীয় সৈন্যদের ওপর নির্ভর করে কি ভারতে সাম্রাজ্য চালানো যায়?

যুদ্ধের মাঝখানে মাদ্রাজের উপকূল বাহিনীর সৈন্যরা বিদ্রোহ করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বানচাল করতে চেয়েছিল। ৯ জন বাঙালী সৈন্যের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে কোনো ক্রমে সেবার বিদ্রোহ চাপা দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের পর, ১৯৪৬ সালে বোম্বাই বন্দরে 'তলবার' জাহাজের নৌ সৈন্যেরা ধ্বনি দিয়ে উঠলো, জয় হিন্দ। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই। ১৯শে ফেব্রুয়ারি নৌ সৈন্যরা ধর্মঘট করে বিপ্লবের ডাক দেয়। তাদের সমর্থন জানিয়েছিল স্থল ও বিমান বাহিনীর সৈনিকেরা। এসব কিসের লক্ষণ? আর একটা বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করলে ব্রিটিশকে আর ধনপ্রাণ নিয়ে এদেশ ছেড়ে যেতে হবে না।

তাই অতিদ্রুত স্বাধীনতা দেবার কথা জানিয়ে দেওয়া হলো। ১৯১৭-এর জুন মাসের তিন তারিখে ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকার ঘোষণা করলেন ১৫ই আগস্ট ভারত বিভক্ত করে দুটি আলাদা রাষ্ট্র কংগ্রেস ও মুশলীম লীগের হাতে তুলে দেওয়া হবে। স্বাধীনতার সেনানীরা ভারতের ছিন্নভিন্ন রূপের কথা আগে স্বপ্নেও ভাবেননি। এখন সেটাই হলো বাস্তব সত্য। মাত্র বাহাত্তর দিনে দুই দেশের সীমানা ভাগাভাগি,

ধনসম্পদ বণ্টন, প্রতিরক্ষা, সৈন্যবাহিনী, চাকরি প্রভৃতি জটিল সমস্যাগুলির মীমাংসা হয়ে গেল তাড়াহুড়ো করে। যাতে দুই খণ্ডেই অসন্তোষ থেকে যায়। পাঞ্জাব আর বাংলাকে টুকরো করে মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হলো এই দুই বিদ্রোহী জাতির। দাঙ্গা ও দেশত্যাগ হলো দু'পক্ষেরই নিত্যবর্ষের ঘটনা।

১৫ই আগস্ট দিল্লীর লালকেল্লায় ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হিসেবে জওহরলাল নেহরু উড়িয়ে দিলেন ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা। গান্ধীজী তখন সেখান থেকে বহুদূরে। তিনি বললেন, আজ যাদের উৎসব করার ইচ্ছে হয় করুক। আজ আমার কান্নার দিন।

স্বাধীনতার পর সেনা ব্যারাক থেকে ব্রিটিশ অফিসাররা চলে যাবার সময় ভারতীয় সহকর্মীদের বিদ্রূপ করে বলেছিল, তোমরা এদেশ সামলাতে পারবে? আমরা সুয়েজ পর্যন্ত পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই তোমরা বাঁচাও বাঁচাও বলে আর্তস্বরে আমাদের ডেকে পাঠাবে।

তারা ভেবেছিল, এতবড় দেশের শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখার ক্ষমতা ভারতীয়দের নেই। না, ইংরেজকে আর ডেকে পাঠাতে হয়নি। বরং ইংরেজকেই সুয়েজের এ পাশের সব বড় বড় ঘাঁটি ছেড়ে যেতে হয়েছে। ভারতের দৃষ্টান্তে এশিয়ার অন্য সমস্ত কলোনিগুলোতে এসেছে স্বাধীনতার জোয়ার। আফ্রিকার দেশগুলিও জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লগ্নেই পৃথিবীতে বেজে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি।

১২

রাসবিহারী বসু, ভগৎ সিং প্রভৃতি বিপ্লবীরা এবং হাজার হাজার সত্যাগ্রহী শুধু এদেশের স্বাধীনতার কথাই ভাবেননি, তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির। বিদেশীর দাসত্ব থেকে স্বাধীনতার পরও বাকি থেকে যায় মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, আত্মবিকাশ ও প্রকাশের স্বাধীনতা। তবু, প্রত্যক্ষ বিদেশী শাসন, যার নাম পরাধীনতা—তার জ্বালা যে কি সাঙ্ঘাতিক, সেই পরাধানতা একটা জাতিকে যে কত হীনমন্য করে দেয়—এই নতুন যুগে যারা জন্মেছে, তারা হয়তো সেটা ঠিক অনুভব করবে না। সেই মর্মযন্ত্রণাতেই হাজার হাজার মানুষ প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতার সংগ্রামে। অনেক সময় তাদের দৃষ্টি ছিল সীমাবদ্ধ, পথে অনেক ভুলভ্রান্তি ঘটেছে—কিন্তু যে উন্নত আদর্শে তাঁদের আত্মদান তা কখনো ব্যর্থ হবার নয়। তাদের প্রতিটি রক্তবিন্দু লেগে আছে এ দেশের ভিত্তি প্রস্তরে।

ভারতীয় নামে একটি জাতির স্বাধীনতা এসেছে, এখন বাকি এই জাতির প্রতিটি মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রার স্বাধীনতা। আমাদের সামনে এখনো সুদীর্ঘ পথ পড়ে আছে।

যাদের নাম আমরা জানি, তাছাড়াও আরও হাজার হাজার সংগ্রামী প্রাণ দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছেন আমাদের স্মৃতি থেকে। তাঁদের সমবেত আত্মদানে অর্জিত এই স্বাধীনতার উত্তরাধিকার এখন আমাদের ওপর বর্তেছে।

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।

চলে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণ পণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি
নব জাতকের কাছে আমার এ দৃঢ় অঙ্গীকার।

অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাবো আশীর্বাদ।
তার পর হবো ইতিহাস।

সমাপ্ত